এই বসন্তে

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. সে ছাড়া পেল বসন্তকালে 3
২. দবির মিয়া নীলগঞ্জের বাজারে 4
৩. রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ 12
৪. দেশের উন্নতি হচ্ছে না....................16
৫. অঞ্জু খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে 24
৬. অমাবস্যার রাতে নীলগঞ্জ বাজারে 32
৭. সন্ধ্যার আগেই বাঁয়া-তবলা নিয়ে....................37
৮. সাইফুল ইসলাম খানার পাশ দিয়ে....................43
৯. জহুরের বিছানা আজ বারান্দায় 44
১০. থানাওয়ালাদের বিরুদ্ধে কেইস....................52
১১. জায়গাটা অন্ধকার 55
১২. চৌধুরী সাহেবের বাড়ি....................59
১৩. রাতে ভালো ঘুম হয় না....................62

১৪. হঠাৎ বৃষ্টি......67
১৫. এশার নামাজের পর......72
১৬. নবীনগর থেকে মনসুরের বাবা......76
১৭. দবির মিয়া বিছানায় শোওয়ামাত্র......80
১৮. সাইফুল ইসলাম ভোরবেলা গলা সাধে......87
১৯. জহুরের শার্টের পকেটে......99
২০. খয়েরী রঙের একটা শাড়ি......107
২১. সাইফুল ইসলাম রাত এগারটার সময়......110
২২. নীলগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে......118
২৩. অঞ্জু স্কুলে গিয়েছে......121
২৪. সন্ধ্যাবেলা মেয়ে দেখতে আসবার কথা......123
২৫. খুঁটি পোঁতা হচ্ছে......129
২৬. কাঁঠাল গাছের নিচে......136
২৭. নাশতা নিয়ে এল অঞ্জু......139
২৮. ট্রেন থেকে নেমে......144
২৯. রাজকন্যার মতো দেখাচ্ছে......148

১. সে ছাড়া পেল বসন্তকালে

সে ছাড়া পেল বসন্তকালে।

কড়া রোদ চারদিকে। বাতাস উষ্ণ। গেটের বাইরে প্রকাণ্ড শিমুল গাছে লাল লাল ফুল। বসন্তকালের লক্ষণ এই একটিই। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস চোখে শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। এ্যাসিস্টেন্ট জেলার সাহেব তাকে শম্ভুগঞ্জ পর্যন্ত রেলের একটি পাস এবং ত্রিশটি টাকা দিয়েছেন। এবং খুব ভদ্রভাবে বলেছেন, জহুর, ভালোমতো থাকবে। ছাড়া পাবার দিন সবাই খুব ভালো ব্যবহার করে।

জহুর আলি ছ বছর তিন মাস পর নীলগঞ্জের দিকে রওনা হল। কড়া বোদ। বাতাস উষ্ণ ও আর্দ্র। বসন্তকাল।

২. দবির মিয়া নীলগঞ্জের বাজারে

দবির মিয়া নীলগঞ্জের বাজারে দশ মণ ডাল কিনতে গিয়েছিল। ডাল কেনার কথা ছিল পনের মণ। কিন্তু টাকার যোগাড় হয় নি। টাকাটা দেবার কথা তার শ্বশুরের। শেষ মুহূর্তে তিনি খবর পাঠিয়েছেন-এখন কিছুই দিতে পারবেন না, হাত টান। বৈশাখ মাসের দিকে চেষ্টা করবেন। বৈশাখ মাসে টাকা দিয়ে সে কী করবে? দবির মিয়া ডালের আড়তে ঘুরতে ঘুরতে তার শ্বশুরকে কুৎসিত একটা গাল দিল। এই লোকের ওপর ভরসা করাটা মস্ত বোকামি হয়েছে। শালা মহা হারামী।

দবির মিয়া মুখ কালো করে ডালের বাজারে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। দুই দিনে বাজার চড়ে গেছে। সরসটা হয়েছে দু শ পঁচিশ। এত দাম দিয়ে ডাল কিনে রাখলে কয় পয়সা আর থাকবে? ডালের পাইকারও বেশি আসে নি। সেতাবগঞ্জের কোনো বেপারী নেই। সেখানে কত করে বিক্রি হচ্ছে কে জানে?

সে বিষণ্ণ মুখে এক চায়ের স্টলে ঢুকে পরপর দু কাপ চা খেয়ে ফেলল। পঞ্চাশ পয়সা করে কাপ। কোনো মানে আছে? কী আছে এর মধ্যে যে পঞ্চাশ পয়সা দাম হবে? তার মেজাজ ক্রমেই উষ্ণ হতে লাগল। এই অবস্থায় সে খবর পেল জহুর ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছে। খবরটা প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারল না। জহুরের মেয়াদ হয়েছেন বছরের। এখনোছ বছরও হয় নি। জেল ভেঙে পালিয়েছে নাকি? দবির মিয়া তৃতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরাল।

এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার, কিন্তু পরের হাটে দাম আরো চড়বে। এই বছর ডালের ফলন কম হয়েছে। কিনতে হলে এখনই কিনে ফেলা উচিত। সেতাবগঞ্জের খবরটা তার আগে জানা দরকার।

দবির মিয়া শেষ পর্যন্ত দু শ উনিশ টাকা দরে ন মণ ডাল কিনল। আগামীকাল ডালের বেপারী বস্তাগুলো পৌছে দেবে।

বাড়ি ফিরতে তার অনেক রাত হল। আজ সকাল সকাল ফেরা দরকার ছিল অথচ আজই দেরি হল। জুমাঘর পার হতেই দবির মিয়া দেখল সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকার। ঝড় নেই, বাদল নেই অথচ কারেন্ট চলে গেছে। এর মানে কী? সেই যদি রোজ হারিকেনই জ্বালাতে হয় তাহলে টাকাপয়সা খরচ করে লাইন আনার মানে কি? এই সব ফাজলামি না?

দবির মিয়ার বাড়ির সামনের বারান্দায় জহুর বসে ছিল। তার সামনের মোড়াতে যে বসে আছে সে খুব সম্ভব অ–অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। দবির মিয়া বলল, কে? অঞ্জু উঠে ভেতরে চলে গেল। জহুর অস্পষ্টভাবে বলল, দুলাভাই, ভালো আছেন?

এ্যাঁ, কে?

আমি, আমি জহুর।

আরে জহুর তুমি, তুমি কোত্থেকে?

দবির মিয়া এমন ভঙ্গি করল যেন জহুর আসার খবর সে আগে পায় নি।

এ্যাঁ, কী সর্বনাশ, আমি তো কিছুই জানি না। থাক থাক, সালাম করতে হবে না। টুনী, এই টুনী, ঘর অন্ধকার–বিষয় কি? কারেন্ট নেই নাকি? এ্যা।

দবির মিয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চা-টা কিছু দিয়েছে? টুনী, এই টুনী। এরা কোন কাজের না। একটা বাতিটাতি তো দিতে পারে। হাত-মুখ ধুয়েছ জহুর?

জ্বি-না।

কোনো খোঁজখবর করে নাই। অপদার্থের গুষ্টি। যাও, গোসল করে ফেল। অল্প পানি দিয়ে গোসল করবে। টিউবওয়েলের পানি ঠাণ্ডা, ফস করে সর্দি লেগে যাবে। হা-হা-হা।

দবির মিয়া হাসিটা মাঝপথে গিলে ফেলল। টিউবওয়েলের পানি ঠাণ্ডা, এর মধ্যে হাসির কিছু নেই। খামাকা হাসছে কেন সে?

জহুর বলল, আপনারা সবাই ভালো ছিলেন তো?

আর ভালো থাকাথাকি। বলবসব। তুমি গোসল-টোসল সার–আমি বালতি–গামছা আনি। আগে বরং চা খাও।

চা খেয়েছি আমি।

আরেক কাপ খাও। চায়ে না নাই।

দবির মিয়া আবার হাসি গিলে ফেলল। হয়েছেটা কি তার? কথায় কথায় হেসে উঠছে কেন? টুনী হারিকেন হাতে ঢুকল। দবির মিয়া ধমকে উঠল, অন্ধকারে বসিয়ে রেখেছিস মামাকে, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে মাথায়?

টুনী মৃদুস্বরে বলল, একটা মাত্র হারিকেন। ছোট মা আবার ফিট হয়েছেন।

কুপি জ্বাললেই হয়। অন্ধকারে বসে থাকবে নাকি?

জহুর বলল, কোনো অসুবিধা হয় নাই দুলাভাই।

বললেই হল অসুবিধা হয় নাই। এদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই। সব কয়টা গরু।

দবির মিয়া ঘরে ঢুকে গেল। অনুফা এই গরমের মধ্যেও লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। তার চুল ভেজা। অর্থাৎ মাথায় পানি ঢালা হয়েছে। যন্ত্রণা আর কাকে বলে। বার মাসের মধ্যে ন মাস বিছানায় পড়ে থাকলে সংসার চলে। দ্বিতীয় বার বিয়ে করাটা চরম বোকামি হয়েছে। অনুফা ক্ষীণ স্বরে বলল, বাজার এনেছ?

হুঁ।

মাছ-টাছ আছে?

আছে।

টুনীর কাছে দাও। তাড়াতাড়ি রান্না শুরু করুক।

দবির মিয়া বাজারের ব্যাগ টুনীর হাতে দিয়ে দিল।

আইড় মাছ আছে। কয়েক টুকা ভাজি করিস টুনী।

অনুফা ক্ষীণ স্বরে বলল, আইড় মাছের ভাজি হয় না।

দবির মিয়া ফোঁস করে উঠল, হবে না আবার কি, হওয়ালেই হয়। যত ফালতু কথা।

বাবলু আর বাহাদুর নিঃশব্দে একটা স্কেল নিয়ে টানাটানি করছিল। দবির মিয়া দুজনের কানে ধরে প্রচণ্ড শব্দে মাথা ঠুকে দিল। দু জনের কেউ টু শব্দ করল না। অঞ্জু মশারি খাটাচ্ছিল, দবির মিয়া তার গালেও একটা চড় কষাল।

পড়াশোনা নাই?

অন্ধকারে পড়ব কীভাবে?

আবার মুখে-মুখে কথা?

দবির মিয়া দ্বিতীয় একটি চড় কল। অনুফা মাথা উচু করে বলল, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়।

তুই চুপ থাক।

তুইতোকারি করছ কেন?

বললাম চুপ।

অঞ্জুর গালে আঙুলের দাগ বসে গেছে। সে এমনভাবে মশারি খাটাচ্ছে যেন কিছুই হয় নি। টুনী ভয়ে-ভয়ে বলল, মাছটা মনে হয় একটু নরম।

দবির মিয়ার মুখ তেতো হয়ে গেল। দেখেশুনে কেনা হয় নি। দেখেশুনে না কিনলে এই হয়। ঈমান বলে কোন জিনিস মাছওয়ালার মধ্যে নেই। অনুফা ক্লান্ত গলায় বলল, কয়েকটা লেবুর পাতা দিস তরকারিতে।

মামা, আপনার গোসলের পানি দিয়েছি।

জহুর দেখল এই মেয়েটি ঘুরেফিরে তার কাছে আসছে। কথা-টথা বলতে চেষ্টা করছে। অন্যরা সবাই দূরে-দূরে। এই মেয়েটির খুব কৌতূহল।

মামা, আমি কল টিপছি, আপনি পানি ঢালেন।

কল টিপতে হবে না। তুই যা।

অঞ্জু মামার কথায় কান দিল না।

তুই কোন ক্লাসে পড়িস?

ক্লাস নাইন, সায়েন্স গ্রুপ।

আর টুনী?

বড়োপা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নাই। তাই বাবা বলল–আর পড়তে হবে না।

ও।

বড়আপার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে।

ও।

আগামী সোমবার দেখতে আসবে।

তাই নাকি?

জ্বি, বড়োআপার ইচ্ছা নাই বিয়ের।

ইচ্ছা নাই কেন?

কী জানি কেন। আমাকে কিছু বলে না। না বললে কি আর জানা যায় মামা?

জহুর জবাব দিল না। টিউবওয়েলের পানি সত্যি সত্যি ভীষণ ঠাণ্ডা। শরীর কাঁপছে। অঞ্জু মৃদু স্বরে বলল, মামা, তুমি এখন কী করবে?

কিছু ঠিক করি নাই।

তোমার কথা কিন্তু মামা আমার মনে ছিল। তুমি একটা গান গাইতে,–মাটিমে পৌরণ মাটিমে শ্রাবণ।

জহুর সারা মুখে সাবান মাখতে মাখতে হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল।

অঞ্জু মৃদু স্বরে বলল, তোমার মনে নাই, না?

না। কিছু মনে নাই।

আমার কথাও মনে নাই?

নাহ।

৩. রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ

নান্টুর চায়ের দোকানে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ। দক্ষিণ দিকের দেয়ালে সে বড়ো করে নটিশ ঝুলিয়েছে–কোনো রাজনীতির আলাপ করিবেন না। রাজনীতির আলোচনার জন্যে কেউ চায়ের দোকানে যায় না। সেখানে আজানের সময়টা বাদ দিয়ে সারাক্ষণই গান বাজে। হিন্দী গান নয়–পল্লীগীতি। নান্টু পল্লীগীতির বড়ো ভক্ত। চায়ের স্টলটি মোটামুটি চালু। সন্ধ্যার আগে আগে এখানে পেঁয়াজু ভাজা হয়। পেঁয়াজু খাবার জন্যে অনেকে আসে। নীলগঞ্জ থানার সেকেণ্ড অফিসার সেপাই পাঠিয়ে রোজ এক টাকার পেঁয়াজু কিনিয়ে নেন। নান্টু অন্যদের টাকায় দশটা দেয় কিন্তু থানাওয়ালাদের জন্যে বারটা।

আজ নান্টুর দোকানে গান হচ্ছিল না। পেঁয়াজুও ভাজা হচ্ছিল না। ভাজাভাজির কাজ যে করে তার জলবসন্ত হয়েছে। নান্টুর মেজাজ এ জন্যেই ঠিক নেই। মেজাজ ঠিক না থাকলে গান-বাজনা জমে না। নাট্ গান বাজায় নিজের জন্যে, কাস্টমারের জন্যে নয়। তাছাড়া তার নিজের শরীর বেজুত লাগছে। তারও সম্ভবত জলবসন্ত হবে। অনেকেরই হচ্ছে। সে ঠিক করল রাত আটটার ট্রেন চলে গেলেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেবে। কিন্তু আটটার ট্রেন আসতে আজ অনেক দেরি করল। থানার ঘড়িতে নটার ঘন্টা পড়ারও অনেক পরে ট্রেনের বাতি দেখা গেল।

নান্টু দোকানের ঝাঁপ ফেলে বাইরে এসে অবাক হয়ে দেখল জহুর আলিকে। মাথা নিচু করে হাঁটছে। জহুর আলি ছাড়া পেয়েছে নাকি? তার ধারণা ছিল যাবজ্জীবন হয়েছে। নান্টু এক বার ভাবল ডাক দেয়। কিন্তু মনস্থির করতে করতে জহুর আলি জুমাঘরের আড়ালে পড়ে গেল। জহুর আলির হাতে একটা দুই ব্যাটারির টর্চ। সে মাঝে মাঝে টর্চের আলো

ফেলছে। চেহারা আগের মতই আছে। একটু অবিশ্যি ভারি হয়েছে। হাঁটছে মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে। আগে বুক ফুলিয়ে হাঁটত।

নান্টু একটা বিড়ি ধরাল। ভালো লাগল না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠছে। অর্থাৎ জ্বর আসছে। জ্বর আসার প্রথম লক্ষণই হচ্ছে প্রিয় জিনিসগুলো বিস্বাদ লাগে। পান মুখে দিলে পানটাকে এখন ঘাসের মতো লাগবে। নান্টু বিড়ি ফেলে দিয়ে গণপতির দোকান থেকে এক খিলি পান কিনল। গণপতি বলল, স্টল বন্ধ করে দিলেন?

হুঁ।

রফিকের নাকি বসন্ত?

জলবসন্ত।

ও, আমি শুনলাম আসল জিনিস।

নান্টু পানের পিক ফেলে বলল, জহুর আলি ছাড়া পেয়েছে।

গণপতি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, কার কাছে শুনলেন?

দেখলাম নিজের চোখে।

নান্টু বাড়ির পথ ধরল। অলকা ডিসপেনসারির কাছে তার সাথে দেখা হল সাইফুল ইসলামের। সাইফুল ইসলাম রাত দশটার দিকে তার স্টলে এক কাপ চা আর একটা নিমকি খায়। নান্টু বলল, দোকান বন্ধ আজকে।

এত সকালে?

শরীরটা ভালো না, জ্বর।

ও।

নান্টু মুখ থেকে পানটা ফেলে দিল। বিস্বাদ। জ্বর তাহলে সত্যি-সত্যি আসছে। সাইফুল ইসলাম সিগারেট ধরাল। নান্টুর বমি-বমি লাগছে। ধোঁয়াটাও অসহ্য লাগছে। নান্টু একদলা থুথু ফেলে বলল, জহুর আলি ছাড়া পেয়েছে, জানেন নাকি?

জহুর আলি কে?

নান্টু কিছু বলল না। এ নতুন লোক। দু বছর আগে এসেছে। এরা কিছুই জানে না। সাইফুল ইসলাম আবার জিজ্ঞেস করল, জহুর আলিটা কে?

নান্টু জবাব দিল না। তার মাথা ঘুরছে। পানের মধ্যে জর্দা ছিল নিশ্চয়ই।

জহুর আলিটা কে?

আপনে চিনবেন না। বাদ দেন।

বলেন না শুনি।

নান্টু বড় বিরক্ত হল। সাইফুল ইসলামকে কথাটা বলাই ভুল হয়েছে। এই লোকটি পিছলা ধরনের। ঘ্যানঘ্যান করতে থাকবে। নান্টু চাপা স্বরে বলল, পরে শুনবেন। এখন বাড়িতে যান।

এত সকালে বাড়িতে গিয়ে করব কী?

যা ইচ্ছা করেন। গান-বাজনা করেন।

গান-বাজনা কি অর্ডারি জিনিস? বললেই হয়? সিগারেট খাবেন?

নাহ্।

খান-না রে ভাই। নেন একটা।

বললাম তো–না।

৪. দেশের উন্নতি হচ্ছে না

দেশের উন্নতি হচ্ছে না কথাটা ঠিক নয়।

নীলগঞ্জ জায়গাটাকে চেনা যাচ্ছেনা। থানার উত্তর দিকের জংলা জায়গায় দশবারটা বড়ো বড়ো বিল্ডিং উঠে গেছে। রাইস মিল, অয়েল মিল, সুরভি লজেন্স ফ্যাক্টরি, আইস ফ্যাক্টরি। জহুরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটা পর্যন্ত পাকা হয়ে গেছে। বাজারের সীমানার পরই সাদা রঙের দোতলা একটা দালান–খায়রুন্নেসা খানম ডিগ্রী কলেজ। খায়রুন্নেসা খানমকে জর চিনতে পারল না। কাউকে সঙ্গে আনা দরকার ছিল। চিনিয়েটিনিয়ে দিত। কিন্তু একা-একা হাঁটতেই ভালো লাগছে।

প্রচুর রিকশা চারদিকে। ফাঁকা রাস্তাতেও এরা সারাক্ষণ টুনটুন করে ঘন্টা বাজায়। এত রিকশা কেন? রিকশা করে যাবার জায়গা কোথায়? আগে ছিল ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দূর দূর থেকে মাল আনত। ধনুকের মতো বেঁকে যেত পিঠ। কিন্তু ঘোড়াগুলো গাধার মতোই নিরীহ ছিল, কিছুই বলত না। জহুর বড়বাজারে উঠে এল। বড়োবাজারে দবির মিয়া নতুন একটা ঘর রেখেছে। জহুরের সেখানে যাওয়ার কথা। দবির মিয়া তার জন্যে অপেক্ষা করছে, দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবে।

বড়োবাজারের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। ছোট-ঘোট ঘুপচি ধরনের টিনের ঘর। ঘর জুড়ে খাট-চৌকি পাতা। এক কোণায় কুৎসিতদর্শন একটা ক্যাশবাক্স। আগরবাতির গন্ধের সঙ্গে আলকাতরার গন্ধ মিশে একটা দম আটকান মিশ্র গন্ধ চারদিকে। মোটামুটি চিত্রটি এই। অবশ্যি দবির স্টোরটি বেশ বড়ো। দেয়ালের র্যাক ভর্তি শাড়ি, লুঙ্গি এবং লংক্রথ।

দোকানে পা দিলেই মনে হয় দবির মিয়া এই ক বছর প্রচুর পয়সা করেছে। জহরকে ঢুকতে দেখেই সে ক্যাশবাক্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করল, দুইটা চা আর পান নিয়ে আয়।

যে-লোকটিকে পান আনতে বলা হল সে বেশ বয়স্ক। পরিস্কার কাপড়চোপড় গায়ে। এদেরকে এত সহজে তুই বলা যায় না। কিন্তু দবির অনায়াসে বলছে। লোকটি জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই সাহেব, শরীরটা ভালো?

জ্বি ভালো। আপনি ভালো?

জ্বি-জ্বি। আমাশা হয়েছিল, এখন আরাম হয়েছে।

দবির মিয়া প্রচণ্ড ধমক দিল, চা না আনতে কইলাম?

লোকটি কাঁচুমাচু ভঙ্গি করে চা আনতে গেল। দবির মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, যার তার সাথে আপনি-আপনি করাটা ঠিক না। ভদ্রলোকের সাথে ভদ্রলোকের ব্যবহার। ছোটলোকের সাথে ছোটলোকের। এই রামজাদারে যে থাকতে দেই এই তার বাপের ভাগ্য।

লোকটা কে?

কেউ না, পাহারা দেয়। রাত্রে দোকানের ভিতরে ঘুমায়। নীলগঞ্জ কেমন দেখলা?

অনেক জমজমাট। নতুন নতুন দালান-কোঠা।

দালান-কোঠা পর্যন্তই সার–আর কিছু নাই। ব্যবসাপাতি বন্ধ। টাকাপয়সার নাড়াচাড়া নাই। অবস্থা সঙ্গিন।

তাই নাকি?

এতটুক জায়গার মধ্যে দুইটা আইস মেশিন। মাছ যা ঘাটে ওঠে তার সবটাই। বরফ দিয়ে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়।

দবির মিয়া থু করে ঘরের মধ্যে একদলা থুথু ফেলল।

আসছ যখন, নিজেই বুঝবে। এক ভাগ পাবদা মাছ দশ টাকা চায়। খাওয়াখাদ্য এখন নাই বললেই হয়।

চা এবং পান এসে পড়ল। লোকটি জহুরের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনে যে আইছেন, সবাই জানে। ছোট চৌধুরী খুব ভয় খাইছে।

দবির মিয়া প্রচণ্ড ধমক দিল।

কত বার বলছি, ফালতু কথা বলবি না। চুপ। একদম চুপা লোকটি চুপ মেরে গেল। জহুর দেখল লোকটির গায়ে ফর্সা পায়জামা-পাঞ্জাবি আছে ঠিকই কিন্তু খালি পা। যারা খালি পায়ে চলাফেরা করে তাদের সহজেই তুই সম্বোধন করা যায়।

বাড়ি ফিরবার পথে দবির মিয়া নানা কথা বলতে লাগল।

কি হয়েছে না-হয়েছে, এইসব মনে রাখা ঠিক না। নতুন করে সব কিছু শুরু করা দরকার। ঠিক না জহুর?

হুঁ।

বয়স তোমার এমন কিছু হয় নাই। বিয়ে-শাদি করা দরকার। মেয়ের জন্য। চিন্তা করবে না। এই দেশে মেয়ের অভাব আছে এই কথাটা ভুল। হা-হা-হা।

জহুর চুপ করে থাকল।

রুজি-রোজগারের চেষ্টা করা দরকার। সেইটাও আমি ব্যবস্থা করব। একটা লঞ্চ কিনার চেষ্টায় আছি। বিশ্বাসী লোকজন আমার নিজেরই দরকার। বুঝলে নাকি জহুর?

জহুর হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ফস করে জিজ্ঞেস করল, বদি ভাইয়ের বৌ কি এখনন নীলগঞ্জেই থাকে?

কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করছি।

থাকে।

শ্বশুরবাড়িতেই থাকে?

হুঁ।

সংসার চলে কীভাবে?

কি জানি কীভাবে। কে খোঁজ রাখে?

দবির মিয়া বিরক্ত হয়ে একদলা থুথু ফেলল। থেমে থেমে বলল, পুরান জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না।

দবির মিয়ার বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। বাহাদুর আর বাবলুর তাড়স্বরে পড়া শোনা যাচ্ছে। দবির মিয়া গলা খাঁকারি দিয়ে আবার বলল, পুরান জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না।

তাকে ঈষৎ চিন্তিত মনে হল।

সেদিনও সে ঈষৎ চিন্তিত হয়েছিল।

রাত সোয়ানটার সময় নীলগঞ্জ থানার দারোগা শামসুল কাদের তাকে থানায় ডাকিয়ে নিয়েছিলেন। জহুর আলি সংক্রান্ত কী-একটা গোলমাল। এরকম গোলমাল জহুরকে নিয়ে লেগেই আছে। নির্ঘাত কাউকে ধমকামকি করেছে। দবির মিয়া থানায় যাবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে খুব রাগরাগি করল, আর এইসব ঝামেলা নিতে পারব না। যথেষ্ট হয়েছে। মানসম্মান সব গেছে। ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে যদি না দিই তাহলে আমার নাম......

থানায় গিয়ে দবির মিয়া আকাশ থেকে পড়ল। জহুর আলিকে শম্ভুগঞ্জে খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। খুন হয়েছে বদি। ব্যাপারটি এমনই অবিশ্বাস্য যে দবির মিয়া ঘটনার উপর তেমন গুরুত্ব দিল না। ভুল হয়েছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমস্তটাই অল্প সময়ের মধ্যে জট পাকিয়ে গেল। তাজ বোর্ডিংয়ের মালিক বলল, জহরকে সে ৯ নম্বর ঘর থেকে বের হতে দেখেছে, তার শার্ট রক্তমাখা ছিল। এবং সে তাজ বোর্ডংয়ের মালিককে দেখে ঘুট করে সরে পড়ে। কী সর্বনাশের কথা!

দবির মিয়া শম্ভুগঞ্জ থানা হাজতে দেখা করতে গেল। উকিল-টুকিল দিতে হয়, শতেক ঝামেলা। জহুরকে খুব বিচলিত মনে হল না। সে বেশ স্বাভাবিকভাবে বলল, মিথ্যা মামলা দুলাভাই। হোট চৌধুরীর কারবার। কিছু হবে না। বদি ভাইকে আমি খুন করব কেন?

তুই তার হোটলে গেছিলি কি জন্য?

গল্প করবার জন্যে গেছিলাম।

দবির মিয়া কপালের ঘাম মুছে ক্লান্ত স্বরে বলল, এখন আমি করি কি?

কিছু করতে হবে না, বসে থাকেন চুপচাপ। বড়োআপা কেমন আছে?

দবির মিয়া তার জবাব না দিয়ে ভোঁ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

যান, ঘোট চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। কাঁদবার তো কিছু হয় নাই।

কাঁদবার কিছু হয় নাই, বলিস কি তুই! আমার কি টাকাপয়সা আছে?

টাকাপয়সার কী দরকার? টাকাপয়সা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা হয়?

দুলাভাই, আপনি চৌধুরী সাহেবের কাছে যান।

ছোট চৌধুরী দবির মিয়ার উপর দারুণ রেগে গেলেন।

খুন হয়েছে বলি, ধরেছে তোমার শালাকে, আমি এর মধ্যে কে? তোমার শালার মাথা আধা-খারাপ আমরা জানি, তোমারটাও যে খারাপ, তা তো জানতাম না।

দবির মিয়া আমতা-আমতা করতে লাগল।

যাও, ভালোমতত উকিল-টুকিল দেও। পয়সাপাতি খরচ কর। অপরাধ একটা করে ফেলেছে, কী আর করা। চেষ্টাটা তোকরাই লাগে।

খুন সে করে নাই চৌধুরী সাহেব।

তুমি আমি বললে তো হবে না–দেখবে কোর্ট।

দবির মিয়া দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বলল, জহুরের মাথাটা গরম, আপনার সঙ্গে বেয়াদপি করেছে অনেক বার......

কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব রাগী গলায় বললেন, এই জন্যে আমি তারে খুনের আসামী দিয়ে দিলাম? অন্য কেউ এই কথা বললে আমি তারে জুপিটা করতাম। নেহায়েত দুঃখে-ধান্ধায় তোমার মাথার ঠিক নাই, তাই কিছু বললাম না।

দবির মিয়া বাসায় ফিরে দেখে তার স্ত্রীর এবরশন হয়েছে। এখন-তখন অবস্থা। দুপুররাতে তাকে নিয়ে ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে যাবার জন্যে ট্রেনে উঠতে হল। কপাল খারাপ থাকলে যা হয়। যে ট্রেনের চার ঘন্টার মধ্যে ময়মনসিংহ পৌছার কথা, সেটা পৌছল ন ঘন্টা পর। ময়মনসিংহ স্টেশনে মরা লাশ নিয়ে দবির মিয়া গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। তার চারপাশে লোক জমে গেল।

৫. অঞ্জু খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে

অঞ্জু খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। যত রাতেই ঘুমাতে যাক সূর্য ওঠার আগে তার ঘুম ভাঙবেই। এত ভোরে আর কেউ ওঠে না। অঞ্জু তাই একা-একা বারান্দার বেঞ্চিটায় বসে থাকে। অবশ্যি গত কয়েক মাস ধরে তাকে একা-একা বেঞ্চিতে বসে থাকতে হচ্ছে না। অঞ্জু পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে তিনটি গোলাপের কলম এনেছে। কলম তিনটি বহু যত্নে লাগান হয়েছে বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গায়। অঞ্জু সকালবেলাটা গাছগুলোর পাশে বসে কাটায়। পানি দেয়। মাটি কুপিয়ে দেয়। এবং যেদিন মন-টন খুব খারাপ থাকে, তখন কথা বলে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে সে গাছগুললার সঙ্গেই কথা বলছে। আসলে তা নয়, সে কথা বলে নিজের মনে। যেমন আজ সকালে সে বলছিল, মেয়েরা বড়ো হলে তাদের গায়ে হাত ভোলা ঠিক না। খুব খারাপ। রাগ হলে বুঝিয়ে বলতে হয়। বোঝালে সবাই বোঝে। বোঝলে যখন। বোঝ তখনই তো সবাই বড়ো হয়। ঠিক না?

অঞ্জু কথাগুলো বলছিল ফিসফিস করে। যেন খুব গোপন কিছু বান্ধবীকে বলা হচ্ছে। টিউবওয়েলে পানি নিতে এসে জহুর অবাক হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করল। অঞ্জু নিচু গলায় গাছের সঙ্গে কথা বলছে।

আমি কখনন আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে রাগ করব না। রাগ করলে কষ্ট পায় না? মন খারাপ হয় না? রাগ করার দরকার কী?

জহুর অবাক হয়ে ডাকল, এই অঞ্জু।

অঞ্জু চমকে পেছন ফিরল।

গাছের সঙ্গে কথা বলছি নাকি রে?

যাও মামা, গাছের সঙ্গে কথা বলব কেন?

অঞ্জু লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেল।

রোজ এত সকালে উঠিস?

হুঁ। তুমিও ওঠ?

উঠি। জেলখানার অভ্যেস।

অঞ্জু উঠে দাঁড়াল। জহুর দেখল এই মেয়েটি দেখতে বেশ হয়েছে। ছোটবেলায় কদাকার ছিল। নাক দিয়ে সব সময় সর্দি পড়ত। বুকের পকেট ভর্তি থাকত রেললাইন থেকে আনা পাথরের টুকরোয়। জহুর যত বারই জিজ্ঞেস করত, পকেটে পাথর নিয়ে কী করিস তুই? তত বারই সে নাকের সর্দি টেনে বলত, পাথর না মামা, গোগেলের ডিম।

জহুর মুখে পানির ঝাপ্টা দিতে দিতে বলল, গোগেলের ডিমের কথা মনে আছে তোর? অঞ্জু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

কি রে, আছে?

আছে।

এখন আর গোগেলের ডিম আনিস না?

অজু সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, চা খাবে মামা?

চা?

হুঁ, একটা হিটার আছে। চট করে বানাব।

ঠিক আছে আন। তুই এ রকম সকালবেলা উঠে একা-একা চা-টা খাস নাকি?

না, তোমার জন্যে বানাব।

অঞ্জু চা নিয়ে আসবার পর জহুর একটা জিনিস লক্ষ করল, অঞ্জু যেন খুঁড়িয়ে। খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

চিনি ঠিক আছে মামা?

ঠিক আছে।

অঞ্জু মামার পাশে বসে নরম গলায় বলল, তুমি কি আবার কলেজে ভর্তি হবে?

নাহ্।

তুমি কী করবে?

জহুর জবাব দিল না। অজু বলল, বাবা বলছিলেন তুমি তার সঙ্গে লঞ্চের ব্যবসা করবে।

জহুর হালকা গলায় বলল, দুলাভাইয়ের অনেক টাকা হয়েছে নাকি রে?

হুঁ।

ঘর-দুয়ার তো কিছু ঠিকঠাক করে নাই।

বাবা টাকা খরচ করে না।

তাই নাকি?

হুঁ। সবাই বলছিল বড়োপাকে দুই-একটা গানটান শেখাতে। তাহলে চট করে বিয়ে হবে। তা বাবা শেখাবে না। হারমোনিয়াম কিনতে হবে যে!

এখন বিয়ে হবার জন্যে গান শিখতে হয়?

হুঁ, হয়। যাদের গায়ের রঙ কালো তাদের হয়।

এখানে গান শেখায় কে?

কে আবার, বগা ভাই।

বগা ভাইটা কে?

তুমি চিনবে না, সাইফুল ইসলাম। বকের মত হাঁটে, তাই নাম বগা ভাই।

অঞ্জু মুখ নিচু করে হাসল। পরমুহূর্তেই হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, অনেকে আবার ডাকে জেলি ফিশ। খুব মজার লোক মামা।

জহুর কিছু বলল না। বাবলু এবং বাহাদুরের কান্না শোনা যেতে লাগল। দবির মিয়ার গর্জনও ভেসে এল, খুন করে ফেলব। আজকে আমি দুটাকেই জানে শেষ করে দেব।

জহুর বলল, ব্যাপার কি অঞ্জু?

ওরা আজ আবার বিছানা ভিজিয়ে ফেলেছে।

দবির মিয়ার রাগ ক্রমেই চড়ছে : হারামজাদাদের আজ আমি বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। ধামড়া ধামড়া একটা, আর কাণ্ডটা দেখ।

জহুর বলল, আমি একটু ঘুরে আসি অঞ্জু।

কোথায় যাও?

এই এনি একটু হাঁটব।

নাস্তা খেয়ে যাও।

এসে পড়ব, বেশি দেরি হবে না।

ছোট চৌধুরী নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজছিলেন। দাঁত মাজার পর্বটি তাঁর দীর্ঘ। বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করেন এবং দাঁত মাজেন। তাঁর পরনে একটি লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির বোম সবগুলো খোলা। মুখ থেকে কম পড়ে পাঞ্জাবির জায়গায় জায়গায় ভিজে উঠেছে। তিনি এটা তেমন গ্রাহ্য করছেন না। কারণ দাঁত মাজা শেষ হলেই তিনি গোসল করেন। গোসলের পানি গরম হচ্ছে।

বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যে-ই হেঁটে যাচ্ছে, তাকেই তিনি দু-একটা ছোটখাটো প্রশ্ন করছেন, কে, জলিল না? আছ কেমন? বড়োছেলের চিঠিপত্র পাও? মনু মিয়া, তোমার বাতের ব্যথা কি কমতির দিকে? এ্যাঁ, আরো বাড়ছে? বল কি!

আজকের রুটিন অন্য রকম হল। তিনি দেখলেন, জহুর আলি হনহন করে আসছে। জহুর আলিকে দেখতে পেয়ে তিনি তেমন অবাক হলেন না। সে যে ছাড়া পেয়েছে এবং এখানে এসে পৌছেছে সে খবর তাঁর জানা। কিন্তু তার হনহন করে হাঁটার ভঙ্গিটা চোখে লাগে। কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এ রকম হাঁটে না। কিন্তু এই সকালবেলা তার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

চৌধুরী সাহেব ভালো আছেন?

চৌধুরী সাহেব চট করে জবাব দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ সময় লাগল।

জহুর না?

হ্যাঁ।

ছাড়া পেয়েছ নাকি?

হ্যাঁ, ছাড়া পেয়েছি।

ভালো, ভালো। খুব ভালো।

ছোট চৌধুরী লক্ষ করলেন জহুর আলি যেন হাসছে। নাকি চোখের ভুল? ইদানীং তিনি চোখে ভালো দেখতে পান না।

জহুর, বসবে নাকি?

নাহ।

জহুর না বলেই গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এর মানে কী? কী বোঝাতে চায় সে?

নীলগঞ্জের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কি বল জহুর?

জহুর তার উত্তরে থেমে থেমে বলল, চৌধুরী সাহেব, কিছু-কিছু জিনিসের কোনো পরিবর্তন হয় না।

বলতে চাও কী তুমি?

না, কিছু বলতে চাই না।

জহুর আলি লোহার গেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল। চৌধুরী সাহেবের গোসলের পানি। গরম হয়েছে খবর আসতেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন। জহুর গেটে হেলান দিয়ে তবু দাঁড়িয়ে রইল। চৌধুরী সাহেবের পানি গরম হবার খবর যে দিতে এসেছিল সে বলল, কিছু চান মিয়াভাই?

জহুর বলল, কিছু চাই না।

৬. অমাবস্যার রাতে নীলগঞ্জ বাজারে

অমাবস্যার রাতে নীলগঞ্জ বাজারে চুরি হবে, এটা জানা কথা। থানাওয়ালা সে জন্যেই অমাবস্যার রাতে নীলগঞ্জ বাজারে একজন পুলিশ রাখে। তবু চুরি হয়। বাজার সমিতির দারোয়ানের নাকের ডগায় চুরি হয়। দবির মিয়া অতিরিক্ত সাবধানী। সে বাজার সমিতির দারোয়ানের ওপর ভরসা না করে এক জন লোক রেখেছে, যে রাতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে সজাগ ঘুম ঘুমায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি। গত রাতে দবির মিয়ার দোকানে চুরি হয়েছে। ক্যাশবাক্সের কোনো টাকা নিতে পারে নি, কারণ সেখানে কোনো টাকা ছিল না। দুই থান ছিটের কাপড়, দশ গজ লংক্রথ। এবং পপলিনের কাটা পিসগুলো নিয়ে গেছে। ক্যাশবাক্সের পাশে গাদা করা ছিল নীল এবং সাদা রঙের মশারি। সবগুলো কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটেছে।

দবির মিয়া দোকানে এসে কেঁদে ফেলল। ছাপ্পান্নটা নতুন মশারি পরশু দিন ময়মনসিংহ থেকে এসেছে। নাইটগার্ডকে দেখা গেল পান খেয়ে মুখ লাল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে-ই আসছে তাকেই মহা উৎসাহে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিচ্ছে, ছাপ্পান্নটা মশারি, নটা শাড়ি, পনেরটা লুঙ্গি আর আপনের কাপড়ের থান সব মিলাইয়া......

দবির মিয়া প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিল নাইটগার্ডের গালে। পুলিশ এল বেলা বারটার দিকে।

দবির মিয়া তখন দোকানে ছিল না। পুলিশ খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করে নাইটগার্ডের কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে গেল। নাইটগার্ডটির বিস্ময়ের সীমা রইল না। এমন একটা কিছু

হতে পারে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল। সে রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই ভাঙা গলায় বলতে লাগল, দবির চাচাজীরে এটু খবর দেন। আপনের পাওডাও ধরি।

বিকেলের মধ্যে নাইটগার্ড আধমরা হয়ে গেল। রুলের বাড়ি খেয়ে তার নিচের পার্টির একটি দাঁত নড়ে গেল। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে এক পর্যায়ে তার অণ্ডকোষ চেপে ধরায় সে তীব্র ব্যথায় বমি করে ফেলল এবং ক্ষীণ স্বরে অর্থহীন কথাবার্তা বলতে লাগল। জমাদার সাহেব বললেন, কি, চুরি করেছিল?

জ্বি।

একাই করেছি, না আরো লোক ছিল?

ছিল। কে কে ছিল?

জ্বি ছিল।

হারামজাদা, ছিল কে?

জ্বি?

তোর সাথে আর কে ছিল?

কয় জন ছিল?

স্যার স্মরণ নাই।

আচ্ছা, অরণের ব্যবস্থা করি, দেখ।

সন্ধ্যাবেলায় দবির মিয়া এসে দেখল থানা হাজতে এক কোণায় কুণ্ডলী পাকিয়ে সে শুয়ে আছে। দবির মিয়া ডাকল, এ্যাই মনসুর, এ্যাই।

মনসুর শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল, কিছু বলল না।

মনসুর ভয় নাই, তরে নিতে আইছি, উইঠা দাঁড়া।

মনসুর উঠে দাঁড়াল না।

হাজতের জন্য প্রান্তে লম্বা দাড়িওয়ালা যে-লোকটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল সে বলল, এই শালার পুতে কাপড়চোপড় নষ্ট কইরা দিছে, গন্ধে থাকন দায়।

দবির মিয়াও তখন একটি তীব্র কটু গন্ধ পেল। ওসি সাহেব এলেন রাত নটায়। দবির মিয়া মনসুরকে ছাড়িয়ে নিতে এসছে শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

ডেফিনিট চার্জ আছে, ওকে ছাড়াবেন কি?

কী চার্জ আছে?

চুরির, আর কিসের? শক্ত প্যাদানি দিলে আগের চুরিগুলোরও খোঁজ পাওয়া যাবে, বুঝলেন?

আগেরগুলোও তার করা নাকি? কী যে বলেন ওসি সাহেব বোকাসোকা মানুষ।

আরে রাখেন রাখেন। ধোলাই দিলেই দেখবেন নাম-ধাম বের হয়ে যাবে। খোলাইয়ের মতো জিনিস আছে?

দবির মিয়া ফিরে আসার সময় দারোগা সাহেব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, শুনলাম আপনার ভাই ছাড়া পেয়েছে।

ভাই না। ছোট শ্যালক।

একই কথা। সে আপনার সঙ্গেই থাকবে?

জ্বি।

ভালো। খেয়ালটেয়াল রাখবেন। জেলখানা জায়গাটা খারাপ। অসৎসঙ্গ। এক বার জেলে গেলে অনেক রকম ফন্দি-ফিকির লোকজন শেখে। বুঝলেন?

দবির মিয়া কিছু বলল না। দারোগা সাহেব একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কানের ময়লা আনতে আনতে প্রসঙ্গ শেষ করলেন, খেয়ালটেয়াল রাখবেন, বুঝলেন। দিনকাল খারাপ।

মনসুরের ব্যাপারটা কী করবেন?

দেখি।

বেচারা নির্দোষ।

দেখি।

দবির মিয়া অত্যন্ত মনমরা হয়ে দোকানে ফিরে এল। দোকান খোলার পরপর আর একটি খারাপ খবর পেল। ডালের দাম পড়ে গেছে, সরসটা দু শ তিন টাকা দরে বিকোচ্ছে। চৌধুরী সাহেব সত্তর মন ডাল কিনে রেখেছেন। সেগুলো নাকি ছেড়ে দেবেন, এরকম গুজব। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

চৌধুরী সাহেব বাজারের মসজিদে এশার নামাজ পড়তে আসেন। কিন্তু নামাজ রাত আটটায় শেষ হয়ে গেছে। আগে আসতে পারলে হত। দবির মিয়া তবু মসজিদের সামনে দিয়ে এক পাক হাঁটল।

মসজিদে ওয়াজ হচ্ছে। মৌলভী আবু নসর সাহেব টেনে টেনে বলছেন, এই দুনিয়াদারী অল্পদিনের। হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ পাক সব মুর্দা জিলা করে তুলবেন। ভাইসব, কারো গায়ে একটা সূতা পর্যন্ত থাকবে না। পুরুষ এবং স্ত্রী উলঙ্গ অবস্থায় উঠে আসবে ভাইসব। কিন্তু কেউ কারো লজ্জাস্থান দেখবে না। তখন সূর্য থাকবে আধ হাত মাথার উপর। ভাইসব জিনিসটা খেয়াল রাখবেন......

৭. সন্ধ্যার আগেই বাঁয়া-তবলা নিয়ে

সাইফুল ইসলাম সন্ধ্যার আগেই বাঁয়া-তবলা নিয়ে দবির মিয়ার বাড়ি উপস্থিত হল। তার কিছুক্ষণ পর ন-দশ বছরের একটা ছেলে মাথায় একটা সিঙ্গেল রীড হারমোনিয়াম নিয়ে ঘামতে ঘামতে এসে উপস্থিত। দবির মিয়া দুজনের কাউকে। কিছু বলল না। অতিরিক্ত গম্ভীর মুখ করে সে বসে রইল।

আজ টুনীকে দেখতে আসবে। বরপক্ষের কেউ যদি গান শুনতে চায়, সেজন্যই এ-ব্যবস্থা। দবির মিয়া কাল রাতেই জানতে পেরেছে টুনী বনের তাপস কুমারী আমি গো এই গানটি হারমোনিয়াম বাজিয়ে নিজে নিজে গাইতে পারে। শোনার পর থেকেই সে গম্ভীর হয়ে আছে। সিও সাহেবের মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে গান শেখার মানেটা কি? এত যদি গানের সখ, তাকে বললেই হত। অবশ্য বললেই যে সে গান শেখার ব্যবস্থা করত, তা নয়। নিতান্তই বাজে খরচ। হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে মুখ বাঁকা করে চ্যাঁচ করার কোন মানে হয়? তাছাড়া শরিয়তেও গান-বাজনা নিষেধ আছে। কঠিন নিষেধ।

দবির মিয়া মুখ গম্ভীর করে থাকলেও আজকে গানের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করে নি। এই মেয়েটি পার করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং নতুন একটা টং হয়েছে, মেয়ে দেখতে এসে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করা, তা গানটান কিছু জানে নাকি?

কি আমার গানের সমঝদার একেক জন। বিয়ের পরপরই ঢুকিয়ে দেবে রান্নাঘরে অথচ কথাবার্তা এ-রকম–যেন মিয়া তানসেন।

সাইফুল ইসলাম বলল, ইনারা দেরি করবেন নাকি?

দবির মিয়া জবাব দিল না। সাইফুল ইসলাম মুখে পাউডার মেখে এসেছে। সেন্ট-দেওয়া রুমাল দিয়ে ঘন ঘন নাক ঘষছে। মাগীমার্কা এই অপদার্থটাকে সহ্য করা মুশকিল। দেখলেই মনে হয় এই হারামজাদা গান শেখাবার ছলে সুযোগ পেলেই মেয়েছেলের গায়ে হাত দেয়।

দবির মিয়া লক্ষ করল অঞ্জু যত বার বাইরে আসছে, তত বারই এই শালা সাইফুল ইসলাম চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। এক বার আবার বলল, এই খুকি, এক গ্রাস জল খাওয়াবে? জল খাওয়াবে কিরে হারামজাদা? পানি আবার জল হল কবে থেকে? দুই ঢোক পানি গিলেই চিকন স্বরে বলল, ধন্যবাদ। দবির মিয়া বহু কষ্টে রাগ সামলে মাগরেবের নামাজ পড়তে গেল।

বরপক্ষের লোকজন এসে পড়ল নামাজের মাঝামাঝি সময়ে। দবির মিয়া ইচ্ছা করে নামাজে দেরি করতে লাগল। মেয়ের বাপ ধর্মভীরু হলে দেখায় ভালো।

মেয়ে দেখতে এসেছে চার জন। মুরব্বি হল ছেলের চাচা, নেত্রকোণার সাবরেজিস্ট্রি অফিসে চাকরি করেন। ছেলে নিজেও এসেছে, সঙ্গে তার দু জন বন্ধু। ছেলে অতিরিক্ত লম্বা। মুখে বসন্তের দাগ। ধূর্ত চোখ। আসার পর থেকেই শেয়ালের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কপালের কাছে বিরাট একটা আছিল–সেখান থেকে তিন-চারটা লম্বা কালো চুল ভুরু পর্যন্ত চলে এসেছে। অথচ প্রস্তাব যে এনেছে সে বলেছিল, রাজপুত্রের মতো গায়ের রঙ, খুব আদব লেহাজ। দবির মিয়া আদব-লেহাজের কিছুই দেখল না। আধা ঘন্টাও হয় নি এসেছে, এর মধ্যে বন্ধুদের নিয়ে তিন বার বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসেছে। অঙ্কুকে দেখে গলা খাকারি দিয়েছে। চড় দিয়ে এই হারামজাদার বিয়ের ইচ্ছা ঘুচিয়ে দিতে হয়।

দবির মিয়া অবশ্য ভদ্রভাবেই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। ছেলের চাচার পাতে প্রবল আপত্তি সত্তেও দুটি সন্দেশ তুলে দিল। আয়োজন ছিল প্রচুর, তবু বেশ কয়েক বার বলল, যোগ্য সমাদর করতে পারলাম না। আমি খুবই শরমিন্দা ইত্যাদি। মেয়ের গান গাওয়ার সময় যখন এল তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এইসব ছেলে-ছোকরার ব্যাপারে সে থাকতে চায় না। দবির মিয়া বারান্দায় এসে দেখে জহুর এসেছে। মোড়ায় বসে চা খাচ্ছে এক-একা।

জহুর, কোথায় ছিলে?

একটু বাইরে গিয়েছিলাম দুলাভাই।

লোকজন আসছে, ঘরে থাকলেই পারতে।

জহুর স্বাভাবিক স্বরেই বলল, দুলাভাই, আমি থাকলে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ হবে। সেটা বিয়েটিয়ের জন্যে ভালো না।

দবির মিয়া চুপ করে গেল। জহুর বলল, যে বাড়িতে এক জন খুনী আসামী থাকে, সে বাড়ির মেয়ে বউ হিসেবে নিতে ভয়-ভয় লাগবে।

বলতে-বলতে জহুর মৃদু হাসল, আর ঠিক তখনি টুনীর গান শোনা গেল, আমি বন ফুল গো......। দবির মিয়া ঢোক গিলল। জহুর অবাক হয়ে বলল, টুনী গাইছে নাকি?

হুঁ?

গান শিখল কবে?

দবির মিয়া উত্তর দিল না। জহুর বলল, দুলাভাই, টুনী এত সুন্দর গান গায়। কী আশ্চর্য। আমি তো......

দবির মিয়া মিনমিন করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না। গান শেষে সাইফুল ইসলামের কথা শোনা গেল, মারাত্মক গলা। নিজের ছাত্রী বলে বলছিনা। হেঁ-হেঁ-হেঁ। খুব টনটনে গলা। খুব ধার।

ওরা মেয়ে পছন্দ করে গেল। মোটামুটিভাবে স্থির হল শ্রাবণ মাসে বিয়ে হবে। দেনা-পাওনা তেমন কিছু না। মেয়ের বাবা ইচ্ছে করে কিছু দিলে দেবেন–সেটা তাঁর মেয়েরই থাকবে। তবে ছেলের একটা মোটর সাইকেলের সখ। হোণ্ডা ফিফটি সিসি। তারা যাবার আগে টুনীকে ময়লা তেল চিটচিটে একটা এক শ টাকার নোট দিয়ে গেল।

দবির মিয়ার খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু সে মনমরা হয়ে রইল। তার ওপর অনুফ যখন বলল, তার ছেলে পছন্দ হয় নি, তখন সে বেশ রেগে গেল। মেয়েছেলেরা ঝামেলা বাধার ওস্তাদ। পছন্দ না-হওয়ার আছে কী? ছেলের জমিজমা আছে। টুকটাক বিজনেস আছে। প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার, অসুবিধাটা কোথায়?

অনুফা মিনমিন করে বলল, ছেলেটা বেহায়া।

বেহায়া? বেহায়ার কী দেখলে? মেয়েমানুষ তো না যে ঘোমটা দিয়ে থাকবে।

অনুফা ঢক গিলে বলল, টুনীর পছন্দ হয় নাই।

টুনীর আবার পছন্দ-অপছন্দ কি? শুধু ফালতু বাত। একদম চুপ।

টুনী কানতাছে।

কান্দুক। তুই চুপ থাক।

তুইতকারি কর কেন?

বললাম চুপ।

দবির মিয়া দোকানে গেল মুখ কালো করে। যাবার পথে এক বার থানায় যাবে, এরকম পরিকল্পনা ছিল। মনসুরের ব্যাপারে কী হল জানা দরকার। কিন্তু থানায় যেতে আর ইচ্ছা করল না। যা ইচ্ছা করুক। মেরে তক্তা বানিয়ে দিক।

জুম্মাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চৌধুরী সাহেব যেন দেখেও দেখলেন না। এর মানেটা কী? দবির মিয়া বলল, চৌধুরী সাহেব না? মালিকুম।

ও, তুমি। এত রাইতে কী কর?

রাত বেশি হয় নাই চৌধুরী সাব। দোকানের দিকে যাই।

চৌধুরী সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তোমার সঙ্গে কথা আছে দবির।

কী কথা, বলেন।

রাস্তার মধ্যে তো কথা হয় না। এক দিন বাড়িতে আস।

এখন যাব? এখন অবসর আছি।

না, এখন না।

কালকে আসব? সকালে?

দিন-তারিখ করবার দরকার নাই। অবসর মতো এক বার আস।

দবির মিয়া অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরে গেল।

৮. সাইফুল ইসলাম খানার পাশ দিয়ে

সাইফুল ইসলাম খানার পাশ দিয়ে বাজারে যাচ্ছিল। নান্টুর দোকানে সে এখন যাবে। একটা চা এবং নিমকি খাবে। মাসকাবারি ব্যবস্থা করা আছে। মাসের শেষে টাকা দিতে হয়। এ ছাড়াও নান্টু লোকটি গান-বাজনার সমজদার। চা খেতেখেতে তার সঙ্গে গান-বাজনা নিয়ে দু-একটা টুকটাক কথা হয়। সাইফুল ইসলামের বড় ভালো লাগে। এই অঞ্চলে গান-বাজনার কোনো কদর নেই। মূখের দেশ।

সাইফুল ইসলাম শব্দ করে করে পা ফেলছিল। তার খুব সাপের ভয়। রাতের বেলা হাঁটাচলা করবার সময় সে সাড়াশব্দ করে হাঁটে। আজও সে গুনগুন করছিল,–আসে বসন্ত ফুল বনে। কিন্তু হঠাৎ সে গান থামিয়ে পাথরের মূর্তির মতো জমে গেল। বিকট চিঙ্কার আসছে থানা থেকে। বিকট এবং বীভৎস। যেন কেউ লোটার একটা হাত টেনে ছিড়ে ফেলেছে। কিংবা একটা চোখ উপড়ে ফেলেছে।

বসন্তকালে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যেও সে কুলকুল করে ঘামতে লাগল। সাপের কথা আর তার মনে রইল না। টর্চ নিভিয়ে সে নিঃশব্দে বাজারের দিকে রওনা হল।

নান্টু মিয়া তার দোকান খোলৈ নি। তার জলবসন্ত হয়েছে। সাইফুল ইসলাম নার দোকানের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরের দিকে রওনা হল। নার দোকান ছাড়া অন্য কোন দোকানে সে চা খায় না। নান্টুর দোকানে সে নিজের পয়সায় একটা কাপ কিনে রেখেছে। এই কাপে নান্টু অন্য কাউকে চা দেয় না।

৯. জহুরের বিছানা আজ বারান্দায়

জহুরের বিছানা আজ বারান্দায় পাতা হয়েছে। টুনী মশারি খাটাতে এসে নরম গলায় বলল, বৃষ্টি হলে কিন্তু ভিজে যাবে মামা। বৃষ্টি হবে আজ রাতে। জহুরের মনে হল টুনীর চোখ ভেজাভেজা।

জহুর নিচু গলায় বলল, তুই তো ভালো গান শিখেছিস।

টুনী চুপ করে রইল। মশারি খাটাতে তার বেশ ঝামেলা হচ্ছে। দড়ি-বাঁধবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। জহুর বলল, মশারি পরে খাটাবি, বস তুই। তোর সঙ্গে তো আমার কথাই হয় না।

রান্না হয় নাই, মামা।

রান্নাবান্না সব সময় তুই করিস নাকি?

মাঝে মাঝে অজু করে। অঞ্জুর রান্না বাবা খেতে পারে না।

তোদের ছোটমা করে না?

ছোটমার শরীর ভালো না। আগুনের কাছে যেতে পারে না।

ঘরের ভেতর থেকে ঠকাঠক শব্দ হতে লাগল। টুনী বলল, এই যে আবার লেগে গেছে।

মারামারি করছে?

হুঁ। এরা নিঃশব্দে মারামারি করে। আমি সামলাই গিয়ে।

টুনী উঠে চলে গেল।

জহুর পরপর দুটি সিগারেট শেষ করল। এ-দুটিই তার সর্বশেষ সিগারেট। দুলাভাইয়ের কাছ থেকে টাকা না চাইলে আর সিগারেট কেনা যাবে না। চাওয়াটা একটা ঝামেলার ব্যাপার। টাকাপয়সা আগে বড়োআপা দিত। দেবার সময় রাগীরাগী একটা ভাব করে বলত, ইশ, আর কত কাল জ্বালাবি? বড়োআপার কথা মনে হওয়ায় জহুরের সামান্য মন খারাপ হল। খুবই সামান্য। এটা লজ্জার ব্যাপার। আরো অনেক বেশি মন খারাপ হওয়া উচিত। চোখ দিয়ে পানি-টানি পড়া উচিত। কিন্তু সেরকম কিছুই হচ্ছে না। খুব লজ্জা এবং দুঃখের ব্যাপার। বড়োআপার মতো

একটা ভালো মেয়ে এই দেশে তৈরী হয় নি।

মামা, তোমার চা!

অঞ্জু চায়ের কাপ বেঞ্চির ওপর নামিয়ে রাখল।

চা তো চাই নি।

খাও একটু। রান্নার দেরি আছে।

অঞ্জু বসল বেধির এক পাশে।

পড়া নেই আজকে?

আছে। তোমার চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে মামা?

ঠিক আছে।

অঞ্জু বসে রইল চুপচাপ।

তুই কি কিছু বলবি নাকি?

অঞ্জু ইতস্তত করে বলল, টুনী আপা তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছে। মামা।

জহুর অবাক হয়ে বলল, সে বললেই তো হয়। উকিল ধরেছে কেন?

তার লজ্জা লাগছে।

কী ব্যাপার?

ঐ ছেলেটিকে আপার পছন্দ হয় নি। আমারও হয় নি।

জহুর অবাক হয়ে বলল, আমাকে বলছিস কেন? দুলাভাইকে বল।

বাবাকে বলে লাভ হবে না।

জহুর চুপ করে গেল। অঞ্জু মৃদু স্বরে বলল, বাবা কারো কথা শোনে না।

জহুর বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দুলাভাইয়ের অনেক পয়সা হয়েছে, না?

হুঁ।

ছেলেটাকে পছন্দ হয় নি কেন?

জানি না। জিজ্ঞেস করি নি।

তোর নিজেরও তত পছন্দ হয় নি। সেটা কী জন্যে?

লোকটার চেহারা দেখলেই মনে হয় কোন একটা মতলব পাকাচ্ছে।

চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না।

অঞ্জু উত্তর দিল না। জহুর ঘোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, জেলখানায় অনেক লোক দেখেছি ফেরেশতার মতো চেহারা, কিন্তু ভয়ংকর সব অপরাধ করে এসেছে। এক জনের নাম ছিল আব্দুল লতিফ, কলেজের প্রফেসর কী চমৎকার চেহারা, কী ভদ্র ব্যবহার। কিন্তু...

কী করেছিল ঐ লোক?

ঐ সব শুনে কাজ নেই।

কত দিনের জেল হয়েছিল ওর।

ফাঁসির হুকুম হয়েছিল।

অঞ্জু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

ঘরের ভেতরে আবার হুটোপুটি শুরু হল। লেগে গেছে দু ভাই। নিঃশব্দ যুদ্ধ চলছে। অঞ্জু ভাইদের সামলাতে চলে গেল।

দবির মিয়া ফিরল রাত এগারটায়।

তার মুখ থমথমে। বলল, ভাত খাব না, খিদে নাই।

ব্যাপার কি দুলাভাই?

ব্যাপার কিছু না। তোমরা না খেয়ে বসে আছ কেন এত রাত পর্যন্ত?

আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

অপেক্ষা করার দরকার নেই। খিদে লাগলে খাবে, ব্যস।

দবির মিয়া বালতি হাতে কলতলায় গা ধুতে গেল।

গায়ে মাখার সাবান নেই কথাটা সকালে বলা হয় নি কেন? এই নিয়ে গর্জাতে গর্জাতে প্রচণ্ড একটা চড় বসাল অজুকে।

সকালে আপনাকে এক বার বলেছিলাম বাবা।

আবার মিথ্যা কথা। বললে আমি শুনলাম না কেন? কান তত এখনন নষ্ট হয় নি। যা, যেখান থেকে পারিস সাবান নিয়ে আয়।

জহুর মোড়াটা উঠোনে নামিয়ে বসেছিল। সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। পরিষ্কার জ্যোৎস। বেশ লাগছে বসে থাকতে।

মামা, একটা গায়ে-মাখা সাবান এনে দেবে?

জহুর দেখল, অজু কথা বলছে বেশ সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। যেন কিছুই হয় নি।

এনে দিচ্ছি। আমার কাছে কোনো টাকা নেই রে অঞ্জু। টাকা দিতে পারবি?

অঞ্জু একটা দশ টাকার নোট এনে দিল।

সাবান ছাড়াও জহুর এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। কিন্তু দোকানদার দাম নিতে চাইল না।

জহুর ভাই, দাম দিতে হবে না।

দাম দিতে হবে না কেন?

জহুর ভাই, আপনি আমারে চিনতে পারছেন না?

দোকানদার লোকটির সমস্ত মুখভর্তি চাপ দাড়ি। মাথায় ফুলতোলা কিস্তি টুপি একটা।

জহুর ভাই, আমি আজমল।

ও, দাড়ি রাখলে কবে?

বেশি দিন না। আপনি আসছেন খবর পাইছি। কিন্তু লজ্জাতেই দেখা করতে যাই নাই।

লজ্জা কিসের?

আপনের বিপদে কোন সাহায্য করতে পারি নাই। অবশ্য সাহায্য করার মতো অবস্থা আমার ছিল না। আমারে জালিয়াতি কেইসের আসামী করছিল। শুনছেন সেটা? বলব আপনেরে। অনেক কথা আছে, জহুর ভাই।

সাবান নিয়ে এসে জহুর দেখল দবির মিয়া গোসলটোসল সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু অজু এবং টুনী। অঞ্জু নাকি ভাত খাবে না, তার খিদে নেই। জহুর বলল, রাগ-টাগ করি না। ভাত খা।

রাগ না মামা, সত্যি খিদে নেই। আমি রাগ-টাগ করি না।

খাওয়ার মাঝখানে টুনী বলল, বাবার দোকানের যে নাইটগার্ডকে ওরা চোর মনে করে ধরেছিল, মনসুর নাম। ওকে থানায় পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

জহুর হাত গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল, কী বলছিস এসব!

হুঁ, সে জন্যেই বাবার এ রকম মেজাজ। মামা, আরেকটু ডাল দেব?

জহুর কোনো জবাব দিল না।

১০. থানাওয়ালাদের বিরুদ্ধে কেইস

তুমি থানাওয়ালাদের বিরুদ্ধে কেইস করতে চাও?

জ্বি।

বেহুদা ঝামেলা করছ দবির।

চৌধুরী সাহেব, একটা নির্দোষ লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

পুলিশে ধরলে কোলে নিয়ে বসায় না, মার দেয়। তোমার ঐ লোক তো আগেই। আধমরা ছিল।

দবির মিয়া মুখ লম্বা করে বসে রইল।

চৌধুরী সাহেব সরু গলায় বললেন, বুদ্ধিমান লোক থানাওয়ালার সাথে বিবাদ করে না। কেইস করতে চাও কর। টাকা খরচ হবে। ফায়দা হবে না কিছু টাকা খরচ করতে পারবে?

টাকা কোথায় আমার?

হুঁ। তাহলে চুপ করে থাক। থানাওয়ালারা মিলে পাঁচ শ টাকা দেবে বলছে। ঐটা নিয়ে পাঠিয়ে দাও।

দবির মিয়া চুপ করে রইল। চৌধুরী সাহেব বললেন, দিনকাল খারাপ। খুব খারাপ। সবার সাবধান থাকা দরকার। বাজে ঝামেলায় যাওয়ার কোন দরকার নাই।

তা ঠিক।

আর তোমার শালাকে বলবে এইটা নিয়ে যেন একটা ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা না করে। কথায়-কথায় আন্দোলন, এই সব বড় শহরে হয়। ছোট জায়গায় হয়। না। তোমার ভালোর জন্যেই বলা।

দবির মিয়া ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

চৌধুরী সাব, তা হলে উঠি?

বস, চা খাও। এই চা দে।

চা আসতে অনেক দেরি হল। চৌধুরী সাহেব দেশের অবস্থা নিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। আলাপের ফাঁকে একসময় বললেন, তোমার শালাকে কোনো কাজেটাজে ঢুকিয়ে দাও, বুঝলে। চুপচাপ ঘরে বসে থাকা ঠিক না। আইস মিলে এক জন স্টোর ইনচার্জ নেবে। তুমি চাও তো ব্যবস্থা করে দিই। পাঁচশ টাকা। মাসে পাবে। ঘরে বসে বসে এই টাকাটাই-বা মন্দ কি? আর কাজকাম ছাড়া ঘরে বসে থাকা যায় নাকি?

দবির মিয়া উত্তর দিল না।

কি, বলব চাকরিটার জন্যে?

চৌধুরী সাহেব, একটু জিজ্ঞেস করে দেখি।

তা দেখ। তবে আমাকে দু-এক দিনের মধ্যে বলবে।

জ্বি, বলব। কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে?

১১. জায়গাটা অন্ধকার

জায়গাটা অন্ধকার।

দুটি জড়াছড়ি করা লিচুগাছ চারদিক অন্ধকার করে রেখেছে। জহুর লিচু-গাছ দুটির নিচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। এ বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। বসার ঘরে হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের অস্বচ্ছ আলো আসছে জানালা গলে। জহুর একবার দেখল শাড়িপরা একটি মেয়ে জানালার ওপাশ দিয়ে হেঁটে গেল। কে? যদি ভাইয়ের বৌ মিনু ভাবী? একটি ছোট্ট ছেলে পড়ছে। বদি ভাইয়ের ছেলে নিশ্চয়ই। আর কেউ তো থাকবে না এখানে। জহুর একটু কাশল। বাড়ির ভেতর থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তী কণ্ঠে কেউ বলল, কে, কে?

জহুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। কত বার এসেছে এ বাড়িতে, প্রতি বারই তার এরকম হয়েছে। মিনু ভাবী যত বার বলেছেন, কে, কে? তত বারই সে অন্য এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করেছে এবং প্রতি বারই ভেবেছে আর আসবে না এ বাড়িতে। তবু এসেছে। মিনু ভাবী বেশ কয়েক বার বলেছেন, আপনি সরাসরি আসেন না কেন? প্রায়ই দেখি লিচুগাছের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর আসেন। অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণ কথা। তবু জহুর কুলকুল করে ঘেমেছে।

মিনু দেখতে এমন কিছু আহামরি নয়। রোগামতো লম্বা একটি মেয়ে। গলায় পাতলা একটি চেইন। মুখে সব সময় পান। জহুর যত বার গিয়েছে তত বার বলেছে, পান দেব আপনাকে ভাই?

জ্বি-না, ভাবী।

না কেন? খেয়ে দেখেন। কাঁচা খয়ের আছে। ও কি, মাথা নিচু করে ফেললেন যো যা ভাবছেন তা না ভাই। পান-পড়া দিচ্ছি না।

মিনু খিলখিল করে হাসত। গলা ফাটিয়ে হাসতেন বদি ভাই। এই জাতীয় রসিকতা বড়ো পছন্দ ছিল বদি ভাইয়ের। কিন্তু শেষের দিকে কী হল কে জানে, জহুর লক্ষ করল বদি ভাই তাকে দেখলেই কেমন গম্ভীর হয়ে পড়তেন। এক দিন পুকুরপাড়ে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, তুই এত ঘনঘন আসিস না, বুঝলি?

কেন?

লোজন নানান কথা বলে। কী দরকার?

জহুর অবশ্যি তার পরেও গিয়েছে। যদি তাই শেষমেষ কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন। শুধু বদি ভাই না, মিনু ভাবীও অস্বস্তি বোধ করত। বেশিক্ষণ থাকত না সামনে। ইশ, রাজ্যের কাজ পড়ে আছে বলেই চট করে উঠে পড়ত।

জহুর সিগারেটটা ফেলে দিল।

হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মিলু। ভয়ার্ত স্বরে বলল, কে ওখানে? কে?

আমি। আমি জহুর।

মিনু বেশ খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

ভাবী, আমাকে চিনতে পারছেন তো?

মিনু মৃদু স্বরে বলল, ভেতরে আসেন জহুর ভাই।

জহুর ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল।

আপনি ছাড়া পেয়েছেন শুনেছি। আপনি না আসলে আমি নিজেই যেতম।

ভালো আছেন ভাবী?

হুঁ।

এইটি আপনার ছেলে? কী নাম?

রতন। এই, চাচাকে মালিকুম দাও।

রতন কিছু বলল না। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল। বদি ভাইয়ের মতো বড়ো বড়ো চোখ হয়েছে ছেলেটির।

জহুর ভাই, আপনি বসেন। এই চেয়ারটায় বসেন।

জহুর বসল না। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে ফেলল, ভাবী, আমি একটা কথা জানতে এলাম। আপনার মনে কি আমাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে? আপনি কি কোনো দিন ভেবেছেন আমি এই কাজটা করেছি?

মিনু ভাবী কঠিন স্বরে বললেন, ছিঃ জহুর ভাই, ছিঃ! আপনি আমাকে এত ছোট ভাবলেন?

জহুর ক্লান্ত স্বরে বলল, জেলখানাতে আমার একটা কষ্টই ছিল। আমি শুধু ভাবতাম, আপনি কি বিশ্বাস করেছেন আমি এই কাজটা করেছি?

মিনু লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। জহুর দেখল, মিনু ভাবীর চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে নি। শুধু মাথার ঘন চুল একটু যেন পাতলা হয়েছে। কপালটা অনেকখানি বড়ো দেখাচ্ছে। গায়ের রংটাও যেন একটু ফর্সা হয়েছে। বয়স বাড়লে গায়ের রং ফর্সা হয় নাকি, কে জানে?

জহুর ভাই, আপনি বসেন।

জহুর বসল। মিনু চলে গেল ভেতরে। শুধু ছেলেটি ঘুরঘুর করতে লাগল। মনে হয় গপ্পট করতে চায়। জহুরের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে শুধু তাকিয়ে রইল। ভেতরে টুনটুন শব্দ হচ্ছে। চা বোধ হয়। চা এবংহালুয়া। জহুরের মনে হল সে অনন্তকাল ধরে এ বাড়ির কালো কাঠের চেয়ারে বসে আছে।

১২. চৌধুরী সাহেবের বাড়ি

দবির মিয়া চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে তার দোকানে চলে গেল। সেখানেও বেশিক্ষণ বসল না, গেল থানায়। ওসি সাহেব ডিউটিতে ছিলেন না। সেকেণ্ড অফিসার অত্যন্ত অমায়িক ভঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন। চায়ের ফরমাস করলেন।

জ্বি-না, চা খাব না।

আরে ভাই খান। ওসি সাহেব আপনাকে ডাকবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন। এসে ভালোই করেছেন।

ডেডবডির ব্যাপারে খোঁজ নিতে আসলাম। ওসি সাহেব সকালে আসতে বলেছিলেন।

ডেডবডি তো রাতেই সুরতহালের জন্য পাঠান হয়েছে।

দবির মিয়া কিছু বলল না। সেকেণ্ড অফিসার বললেন, বুঝলেন ভাই, রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম। যখন বলল মনসুর কেমন-কেমন করে যেন শ্বাস নিচ্ছে, তখনই বুঝলাম অবস্থা খারাপ।

ডাক্তার ডাকিয়েছিলেন?

আরে, ডাক্তার ডাকব না? বলেন কি আপনি। পুলিশের চাকরি করি বলেই কি অমানুষ হয়ে গেলাম নাকি ওসি সাহেব নিজে গিয়ে দুধ গরম করে আনলেন।

ডাক্তার এসেছিল?

বললাম তো তাই এসেছিল। আর আপনি যা ভাবছেন, পিটিয়ে মেরে ফেলেছি। আমরা, সেটাও ঠিক না। মারধোর হয়, কিন্তু মানুষ মেরে ফেলবার মতো মারধোর কি করা যায় নাকি? থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে ফ্যামিলি নিয়ে থাকি। ছেলেপুলে আছে। এর মধ্যে এরকম একটা কাণ্ড কি করা যায়? আপনিই বলেন।

তাহলে লোকটা মরল কীভাবে?

ভয়ে। স্রেফ ভয়ে, আর কিছু না। এখন যদি পাবলিক হৈ-চৈ শুরু করে, তাহলেই মুশকিল। পুলিশ সম্পর্কে পাবলিকের ধারণা খারাপ। এই যে মুক্তিযুদ্ধে এতগুলো পুলিশ আমরা মারা গেলাম–কেউ মনে রাখছে সে-কথা, বলেন? মিলিটারি অফিসার যে কজন মারা গেছে পুলিশ অফিসার মারা গেছে তার চার গুণ। সেই সব কথা আর কারো মনে নেই। ঠিক বলেছি কিনা বলেন?

দবির মিয়া জবাব দিল না।

এই জন্যেই ওসি সাহেব আপনাকে খবর পাঠিয়েছেন, পাবলিক যাতে হৈ-চৈ শুরু না করে।

আমার এইখানে কী করার আছে? কী বলছেন এই সব

সেকেণ্ড অফিসার হাসিমুখে বললেন, আপনি বলবেন মনসুর মিয়া চুরির মধ্যে ছিল। তার জন্যেই চুরি হচ্ছিল এত দিন।

কী বলছেন এই সব? চোর-ডাকাতের জন্যে মানুষের কোনো সিমপ্যাথি নেই। চোর-ডাকাত শেষ হলেই পাবলিক খুশি।

আমি একটা নিরপরাধ মানুষকে চোর বাবা

নিরপরাধ, বুঝলেন কী করে? ব্যাটা শুধু চুরি না, ডাকাতির মধ্যেও ছিল। প্রমাণ আছে রে ভাই। বিনা প্রমাণে তো বলছি না। মারাত্মক শয়তান পোক, এত দিন টের পান নি।

দবির মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সেকেণ্ড অফিসার সাহেব বললেন, চা খান, ঠাণ্ডা হচ্ছে। চিনি ঠিক হয়েছে কিনা দেখেন তো। এরা চিনি দিয়ে একেবারে সরবত বানিয়ে রাখে। এককাপ চায়ে এক পোয়া চিনি দেয়। মনে করে মিষ্টি দিলেই চা ভালো হয়।

১৩. রাতে ভালো ঘুম হয় না

সাইফুল ইসলামের রাতে ভালো ঘুম হয় না।

তার ঘরটি ছোট। একটিমাত্র জানালা, তাও বন্ধ করে রাখতে হয়। কারণ জানালার ওপাশে মুন্সি সাহেব গরুর গোবর পাবার ব্যবস্থা করেছেন। জানালা ভোলা থাকলে পচা গোবরের গন্ধ বুকের ওপর চাপ হয়ে থাকে। সাইফুল ইসলাম বন্ধ ঘরের গরমে হাঁসফাঁস করে। অর্ধেক রাত পর্যন্ত তালপাতার পাখায় হাওয়া খায়। দু-তিন বার বাইরের মাঠের একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে যখন ঘুমে চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, তখন শুতে যায়। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে ঘুম চটে যায়। তালপাখা দত নাড়াতে নাড়াতে ভাবে–এই জায়গায় থাকা যায় না। খোলামেলা একটা জায়গা নিতে হবে।

অবশ্যি সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। মুন্সি সাহেবের এই ঘরটায় সে বিনা ভাড়ায় থাকতে পারে। তার বদলে মুন্সি সাহেবের একটি নাতিকে পড়াতে হয়। নাতিটির নাম বজলুর রশিদ। পড়াশোনায় কোনোমন নেই। কিছু বললেই বিকট সুরে চিৎকার করে। সে চিৎকারে আশেপাশে ভূমিকম্প হয়ে যায়। ছেলেটির মা পর্দার আড়াল থেকে চিকন সুরে বলে, কি হয়েছে রে বজলু?

আমারে মারছে।

বজলুর মার চিকন গলা আরো চিকন হয়ে যায়, মাষ্টার সাব, পুলাপান মানুষরে মাইরধোইর কইরেন না।

সাইফুল ইসলাম প্রতিবারই বলে, জ্বি-না, মারি নাই। আরব কেন?

কিন্তু ছেলেটির মা বিশ্বাস করে না। কারণ সে দীর্ঘ সময় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। পর্দার নিচ দিয়ে তার ফর্সা পা দেখা যায়। এরকম ফর্সা পা সাইফুল ইসলাম আর দেখে নি। ছেলেটি অবশ্যি তার মার মতো হয় নি। শ্যামলা রঙ। দাঁতগুলো বের হয়ে আছে। কে জানে তার মার দাঁতও উচু কিনা। উচু হওয়াই স্বাভাবিক। এমন টকটকে যার গায়ের রঙ, তার কোনো খুঁত না থাকলে হয় না। মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে সে এই সব জিনিস খুব খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শিখেছে। সে দেখেছে খুব ফর্সা মেয়ের ঠোটের কাছে অস্পষ্ট একটা গোঁফের রেখা থাকে, পায়ের লোমগুলো হয় বড়ো বড়ো। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের এক শালীকে সে গান শেখাত। সে মেয়েটি ছিল অসম্ভব ফর্সা। কিন্তু বড়ো বড়ো কুৎসিত লোম ছিল পায়ে। লোমগুলো লালচে ধরনের। বাদামীও হতে পারে। ভালো মতো লক্ষ করা যায় নি। মেয়েটি ঝট করে শাড়ি টেনে দিয়েছে। মেয়েদের বোধহয় ঘাড়ের কাছে অদৃশ্য এক জোড়া চোখ থাকে। মাথা না ঘুরিয়েও অনেক কিছু টের পায়।

লোম থাকুক আর যাই থাকুক, ফর্সা মেয়েদের সাইফুল ইসলামের বড়ো ভালো লাগে। সার্কেল অফিসার সাহেবের হোট মেয়েটিও ফর্সা। তাকেও সাইফুল ইসলামের ভালো লাগে।

যে-সব রাত্রিতে তার ঘুম আসে না, সে-সব রাত্রিতে সে ধবধবে ফর্সা কোনো একটা মেয়ের কথা চিন্তা করে–যার গায়ের চামড়া অসম্ভব মসৃণ। যেন সেই মেয়েটি পাতলা একটা শাড়ি (হলুদ বা কমলা রঙের) পরে রাতে ঘুমাতে এসেছে। সাইফুল ইসলাম বলল, এত সকাল সকাল ঘুমাও কেন গগা, একটু চা-টা কর না।

চা খেলে তো তোমার ঘুম আসবে না। না আসুক, কর একটু।

মেয়েটি হাসিমুখে চা বানিয়ে আনল। রাগ করে (কপট রাগ) বলল, চা খাওয়াটা কমাও। বড়ো বেশি চা খাও তুমি, ভালো না। এই গরমে কেউ চা খায়। আমি তো সেদ্ধ হয়ে গেলাম।

সাইফুল ইসলাম রহস্য করে বলল, বেশি গরম লাগলে কাপড় খুলে ফেললেই হয়, হা হা হা।

ছিঃ, কী অসভ্যতা যে কর! ভাল্লাগে না।

অসভ্যতা কী করলাম, কেউ তো দেখতে আসছে না।

মেয়েটি তখন সত্যি রাগ করে ঘুমাতে গেল। সাইফুল ইসলাম চা শেষ করে মশারির ভেতর ঢুকে দেখে মেয়েটি কাপড়চোপড় খুলেই শুয়েছে। গত দু-তিন রাত সে এই জাতীয় কিছুই ভাবতে পারছে না। বারবার থানার পাশ দিয়ে আসবার সময় শোনা বীভৎস চিৎকার মনে আসছে। চিৎকার যে এত কুৎসিত হয়, কে জানত!

তার জানতে ইচ্ছা করে চিৎকারটা দিয়েই লোকটা মরল কিনা। লেকটা অবশ্যি মস্ত চোর ছিল। বাজারের চুরিগুলো সেই করিয়েছে। দবির মিয়া বলেছে, তার জিনিসপত্র কিছু কিছু পুলিশ উদ্ধার করেছে। চোর-ডাকাত যত কমে ততই ভালো। থানায় দু-একটা চোর-ডাকাত মারা পড়ার ভালো দিক আছে। চোর-ডাকাত সতর্ক হয়ে যায়। ওসি সাহেব খুব কড়া লোক, এইটা প্রচার হয়। কিন্তু তবু সাইফুল ইসলাম চিৎকারটার কথা ভুলতে পারে না। সে এক রাত্রে হাতের লেখাটা অন্যরকম করে নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবকে একটা সুদীর্ঘ

চিঠি লিখে ফেলে। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে পিটিয়ে মারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তার জন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে ইত্যাদি। চিঠির শেষে নাম লেখে জনৈক পথিক।

চিঠিটা সে অবশ্যি পাঠানর জন্যে লেখে নি। এ রকম চিঠি সে তার ছাত্রীদের প্রায়ই লেখে এবং কখনো পাঠায় না। কারণ সুদীর্ঘ সেই সব চিঠির প্রায় সবটাই সীমাহীন অশ্লীলতা। পাঠানর প্রশ্নই ওঠে না। ওসি সাহেবের চিঠিতেও খানিকটা অশ্লীলতা ছিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সে লিখেছে কি করে ওসি সাহেবকে খুশি করা হবে এবং বিচি দুটি ফেলে দিয়ে রসুনের কোয়া ভরে দেওয়া হবে।

না পাঠানর জন্যে লেখা হলেও শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পাঠিয়ে দিল। অনিদ্রা নোগটা তার খুব বাড়ল তার পরপরই। থানার পাশ দিয়ে সে হাঁটা ছেড়ে দিল।

পঞ্চম দিনে ওসি সাহেব লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। এবং অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, কি, আপনাকে তো আজকাল দেখিই না?

সাইফুল ইসলাম ঢোক গিলল।

তা আছেন কেমন?

জ্বি, ভালো।

এসপি সাহেব আসছেন ময়মনসিংহ থেকে। একটা আসামী যে মারা গেছে। সেই তদন্তে।

সাইফুল ইসলাম ছাইবর্ণ হয়ে গেল।

এসপি সাহেব আবার গান-বাজনার খুব সমঝদার। একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা করতে পারবেন?

জ্বি জ্বি, তা তা...

দেখেন যদি পারেন। এই শহরে আপনি ছাড়া আর কেউ তো নেই। এই, একে চা-মিষ্টি দে।

১৪. হঠাৎ বৃষ্টি

মাঝরাত্রে হঠাৎ করে বৃষ্টি নামল। জহুর বিছানা টেনেটুনে এক পাশে নিয়ে এল। তাতেও শেষরক্ষা হল না। তোষকের অনেকখানি ভিজে চুপসে গেল। মশারি উড়তে লাগল নৌকার পালের মত। বাড়ির লোকজনদের না জাগিয়ে ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। জহুরের কাউকে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। যেরকম বাতাস হচ্ছে, এমনিতেই কারো-না-কারো ঘুম ভাঙবে।

ঘুম অবশ্যি ভাল না। জহুর পা গুটিয়ে বেঞ্চির উপর বসে বৃষ্টি দেখতে লাগল। তার সিগারেট রাবার ইচ্ছা করছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে আগুনের স্পর্শের জন্যে মন কাঁদে। সিগারেট নেই, শেষ সিগারেটটি ঘুমাবার আগে ধরিয়েছে। এরকম একটি ঝড়-বাদলের রাত একা-একা জেগে কাটান কষ্টকর। জহুরের শীত লাগছিল। গায়ে দেবার কিছু নেই। চারটি ভিজে ন্যাতান্যাতা।

মামা।

জহুর চমকে উঠে দেখল কোনো রকম শব্দ না করে অঞ্জু দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে তার লম্বা চুল উড়ছে। অজুর চুল যে এত লম্বা, সে আগে লক্ষ করে নি। জহুর বলল, ভালো বর্ষণ শুরু হয়েছে, দেখলি?

তুমি ডাকলে না কেন আমাদের?

তোরা নিজে থেকে উঠবি, তাই ভেবে ডাকি নি।

অঞ্জু ভারি স্বরে বলল, তুমি এমন ভাব কর, যেন তুমি বেড়াতে এসেছ আমাদের এখানে।

জহুর জবাব দিল না। অঞ্জু বলল, ছোটমার সঙ্গেও তুমি বেশি কথা বল না। শুধু হাঁ-হুঁ কর। ছোটমার ধারণা তুমি তাকে দেখতে পার না।

দেখতে পারব না কেন?

অঞ্জু বেঞ্চির এক পাশে বসল। জহুর বলল, বসলি কেন? ঘুমাতে যা।

তোমার সঙ্গে বসে বসে একটু বৃষ্টি দেখি।

ঘরের ভেতরে বাবলু জেগে উঠে চেঁচাতে শুরু করেছে। দবির মিয়া চাপা গলায় কী একটা বলল। বাবলুর চিৎকার আরো তীক্ষ্ণ ও তীব্র হল। প্রচণ্ড একটা চড় কল দবির মিয়া। মুহূর্তে সব চিৎকার-চেঁচামেচি থেমে গেল। শুনশান নীরবতা। জহুর বলল, ঘুমাতে যা।

আরেকটু বসি।

দুলাভাইয়ের সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এনে দে।

অঞ্জু উঠে চলে গেল। সিগারেট নিয়ে চলে এল সঙ্গে সঙ্গে। তার পিছে পিছে এল বাবলু। জহুর অবাক হয়ে বলল, কি রে বাবলু? কী হয়েছে?

ঘুম আসে না, ভয় লাগে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ভয়ের কী আছে?

বাবলু উত্তর না দিয়ে বয়স্ক লোকের মতত গম্ভীর হয়ে বসল বেঞ্চিতে। জহুর হাসিমুখে বলল, বাবলু, বৃষ্টিতে ভিজে যাবি।

বাবলু সে কথার উত্তর দিল না। সে খুবই স্বল্পভাষী।

অঞ্জু বলল, টুনী আপার বিয়েটা ভেঙে গেছে, তুমি শুনেছ নাকি মামা?

না তো! কী জন্যে ভাঙল?

তা জানি না। বাবা তো কাউকে কিছু বলে না।

বৃষ্টির বেগ খুবই বাড়ল। জহুর দেখল, বাবলু ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অঞ্জু ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মেয়ে হয়ে জলে খুব মুশকিল।

মুশকিল কেন?

অঞ্জু জবাব দিল না।

বাবলুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

অঞ্জু উঠে বাবলুকে কোলে নিয়ে বসল। হালকা গলায় বলল, টুনী আপা আজ সারা দুপুর কেঁদেছে।

কেন? আমি তো জানতাম ছেলে তার পছন্দ হয় নি।

তা হয় নি।

তবে কান্নাকাটি কি জন্যে?

অঞ্জু জবাব দিল না। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। অঞ্জু অস্পষ্ট সুরে বলল, মামা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কী কথা?

তুমি নাকি বলেছিলে, জেল থেকে ফিরে এসে চৌধুরী সাহেবকে খুন করবে?

মনে নেই, বলতে পারি।

সত্যি সত্যি করবে না নিশ্চয়ই

জহুর জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরাল। ঘরের মধ্যে এবার বাহাদুরের চিৎকার এবং দবির মিয়ার গর্জন শোনা যেতে লাগল, হারামজাদাদের যন্ত্রণায় শান্তিতে ঘুমানব উপায় নাই। সব কটাকে কচুকাটা করা দরকার।

মামা।

উঁ।

তুমি নাকি বদি চাচার বাসায় গিয়েছিলে?

জহুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কার কাছ থেকে শুনলি?

বাবা বলছিল ছোটমাকে। আড়াল থেকে শুনে ফেললাম।

জহুর চুপ করে গেল।

গিয়েছিলে নাকি মামা?

হুঁ।

ওদের ছেলেটাকে দেখেছ? খুব সুন্দর না?

খুব কিন্তু পাজি। দেখলে বোঝা যায় না। বিন্দু একেবারে।

১৫. এশার নামাজের পর

এশার নামাজের পর চৌধুরী সাহেব বাড়ি ফিরবার সময় লক্ষ করলেন জহুর হনহন করে বাজারের দিকে যাচ্ছে। চৌধুরী সাহেব গলা খাকারি দিলেন। জহুর তাঁর দিকে তাকাল, কিন্তু থামল না। যেমন যাচ্ছিল, তেমনি যেতে লাগল। তিনি ডাকলেন, এই

যে, জহুর না?

জহুর দাঁড়াল।

তোমার দুলাভাইয়ের সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল।

বলব তাঁকে।

জহুর আর দাঁড়াল না। চৌধুরী সাহেব হটতে শুরু করলেন। জহুরের ভাবভঙ্গি তাঁর মোটও ভালো লাগছে না। এই সব ভালো লক্ষণ নয়। তিনি জহুর কী করছে না-করছে, সে সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন। কিছুই করছে না। ঘরেই বসে সময় কাটাচ্ছে। কোনো মতলব পাকাচ্ছে নিশ্চয়ই। তাঁর নিজের কোনো ঝামেলায় জড়াতে এখন আর ইচ্ছা করছে না। বয়স হয়ে গেছে। শান্তিতে সময় কাটাতে ইচ্ছা হয়।

চৌধুরী সাহেব বাড়ির কাছে এসে দেখেন সাইফুল ইসলাম গেটের কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

স্লামালাইকুম চৌধুরী সাব।

ওলায়কুম সালাম। কি ব্যাপার?

আপারে একটা কথা বলতে এসেছি, চৌধুরী সাব।

বল।

শুনছেন বোধ হয় এসপি সাব আসতেছেন তদন্তে।

হ্যাঁ, জানি।

এসপি সাবের সাথে একটা কথা বলতে চাই চৌধুরী সাব।

বলতে চাইলে বল। আমাকে বলছ কেন?

জ্বি?

আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

সাইফুল ইসলাম হাত কচলাতে লাগল।

কী বিষয়ে কথা বলতে চাও?

এ্যাঁই ইয়ে—আপনার গান-বাজনা নিয়ে। এসপি সাবে গান বাজনার খুব সমঝদার।

তোমার কথাবার্তা বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা কি?

সাইফুল ইসলাম আমতা-আমতা করতে লাগল। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ভেতরের কথাটা কি বল তো।

সাইফুল ইসলাম রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে বলল, থানাওয়ালারা লোকটারে খুন করছে চৌধুরী সাব।

বলছে কে তোমাকে? সাইফুল ইসলাম জবাব দিল না।

জহুর বলছে নিশ্চয়ই। শোনো সাইফুল ইসলাম, তুমি বিদেশী মানুষ, কিছু জান-টান না। জহুরের স্বভাব-চরিত্র তুমি জান না। সে যে খুন করেছিল সেইটা জান?

জ্বি, শুনছি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কমাণ্ডার আছিল, অনেক কাজকারবার করছে, বুঝলে? ডেঞ্জারাস লোক। যে যেটা বলে, সেটাই বিশ্বাস করতে হয় না। চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। চিন্তা-ভাবনা করবার জন্যে আল্লাহ একটা মাথা দিয়েছে। বুঝলে?

চৌধুরী সাহেব হাঁপাতে লাগলেন। হঠাৎ করেই মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে শুরু করেছে। সাইফুল ইসলাম বলল, জহুর ভাই আমাকে কিছু বলেন নাই।

চৌধুরী সাহেব চোখ লাল করে তাকালেন।

বিষয়টা আমার নিজের মনে আসল।

নিজের মনে আসল?

জ্বি।

কী করতে চাও তুমি?

সাইফুল ইসলাম রুমাল দিয়ে ঘনঘন নাক মুছতে লাগল।

কী করতে চাও তুমি?

কিছু করতে চাই না চৌধুরী সাব।

তাহলে খামোকা বকবক করছ কি জন্যে?
সাইফুল ইসলাম খকখক করে কাশতে লাগল।
যাও আমার সামনে থেকে।

সাইফুল ইসলাম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

চৌধুরী সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি প্রচণ্ড একটা চিৎকার করলেন, যাও, ভাগ।

সাইফুল ইসলাম তাড়াতাড়ি পা ফেলতে গিয়ে বড় রকমের একটা হোঁচট খেল।

১৬. নবীনগর থেকে মনসুরের বাবা

নবীনগর থেকে মনসুরের বাবা এসে হাজির। বরকত আলি। দবির মিয়ার ধারণা ছিল, মনসুরের নিকট আত্মীয় কেউ নেই। মনসুর প্রায়ই বলত, একলা মানুষ আমি, একটা মুটে পেট। কিন্তু মনসুরের বাবার কাছে জানা গেল–মনসুরের পাঁচ বছর বয়সের একটা ছেলে আছে। ছেলেটা তার নানাবাড়ি থাকে। তার মার বিয়ে হয়ে গেছে অন্য জায়গায়। দবির মিয়া শুকনো গলায় বলল, আপনি কী করেন?

কিছু করি না জনাব। সামান্য জমিজিরাত আছে। টুকটাক ব্যবসা আছে।

দবির মিয়া দেখল বরকত আলির মধ্যে একটা সচ্ছল ভাব আছে। গায়ের নীল রঙের পাঞ্জাবিটা বেশ পরিষ্কার। পায়ে স্যাণ্ডেল।

কিসের ব্যবসা আপনার?

ওষুধের। আমার একটা কানপাকার ওষুধ আছে। চালু ওষুধ।

নিজের আবিষ্কার?

জ্বি না, আমার আজানের। হেকিম শরিয়ত আলির।

দবির মিয়া ঈষৎ কৌতূহলী হয়। বাবলুর কানপাকার ঝামেলা আছে। ঠাণ্ডা লাগলেই তার কান দিয়ে পুঁজ পড়ে।

ওষুধ কি রকম?

ভালো ওষুধ, খুব চালু।

বরকত আলি তার চামড়ার ব্যাগ খুলে ফেলল। ব্যাগভর্তি ছোছোট শিশি। শিশিতে সবুজাভ একটি তরল পদার্থ। সঙ্গে ছাপান হ্যাণ্ডবিল আছেঃ শরিয়ত আলির স্বপ্নপ্রাপ্ত কর্ণশুদ্ধি আরক।

কত করে?

দামটা একটু বেশি। পাঁচ টেকা! আপনে একটা ফাইল রাখেন। টেকা লাগব না।

দবির মিয়া চা আনতে লোক পাঠাল। বরকত আলিকে তার ছেলের ব্যাপারে মোটই বিচলিত মনে হল না। চা খেতে খেতে বলল, কর্মফল, বুঝলেন ইসাব? ছেলেটারে কত কইলাম ব্যবসাপাতি দেখ। সূতিকা রোগের একটা ওষুধ আছিল, একটা আছিল বাতের, বাতনাশক কালে বড়ি। কিছুই শুনা না। মাথা খারাপ ছোট বয়স থেকেই।

ছেলের মরার খবর পেয়েছেন কবে?

বিষ্যুত বারে।

কে দিল খবর?

ললাকের মুখে শুনলাম। খুব আফসোসের কথা।

হুঁ।

তা শুনলাম, ওসি সাহেব দশ হাজার টেকা দিবে ক্ষতিপূরণ। ক্ষতিপূরণ টেকায় তো হয় না। তা কী করা বলেন?

ক্ষতিপূরণের কথাটা শুনলেন কোথায়?

লোকজনের মুখে শোনা। কথাটা কি সত্যি?

আমি জানি না। আপনি দেখেন খোঁজ নিয়ে।

আপনারে সাথে নিয়া একটু যাইতে চাই।

দবির মিয়া গভীর হয়ে বলল, যান, আপনে একাই যান।

কয়েকটা দিন আপনার এইখানে থাকা লাগতে পারে। আপনার কোনো অসুবিধা নাই তো জনাব?

না, অসুবিধা নাই। মনসুর আপনার ছেলে তো?

জ্বি, প্রথম পক্ষের সন্তান। অজুর পানি কই পাওয়া যায়, আছরের নামাজের সময় হইছে মনে হয়।

দবির মিয়া তাকে মসজিদটা দেখিয়ে দিল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, জুঘরের গোরস্থানে মনসুরের কবর আছে। বললে ওরা দেখিয়ে দেবে।

বরকত আলিকে ছেলের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হল না। সে কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করল। নান্টুর দোকানে চা খেল। বিকালের ট্রেনে বরফ বোঝাই বাক্সে যে-সব মাছ যায় সে-সব মাছ দর-দাম করল। নীলগঞ্জ শহরে একটা হেকিমী ওষুধের দোকান চলবে কিনা, সেই সম্পর্কে খোঁজ-খবর করল।

ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল মাগরেবের নামাজের পর। ওসি সাহেব ছিলেন না। সেকেণ্ড অফিসার তাকে বিশেষ সমাদর করলেন। নান্টুর দোকান থেকে পিয়াজু এনে খাওয়ালেন। নগদ পয়সা দিয়ে দু ফাইল শরিয়ত আলির স্বপ্নপ্রাপ্ত কর্ণশুদ্ধি আরক কিনে রাখলেন। বরকত আলি অভিভূত হয়ে পড়ল। চার পাশে এমন সব হামদর্দ লোকজন। আজকালকার যুগে এমন দেখা যায় না।

১৭. দবির মিয়া বিছানায় শোওয়ামাত্র

দবির মিয়া বিছানায় শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আজ রাতে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে রাত দুটা বাজল-ঘুম এল না। তার পাশে অনুফা ঘুমাচ্ছে মড়ার মত। মরেই গেছে কিনা, কে জানে। শ্বাস ফেলার শব্দ পর্যন্ত নেই। দবির মিয়া চাপা স্বরে বলল, এ্যাই, এ্যাই। কোনো সাড়া নেই। মেয়েরা বড় হয়েছে। এখন আর মাঝরাতে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে ডেকে তোলা যায় না। মেয়েরা শুনে কি-না-কি ভেবে বসবে। দবির মিয়া অনুফাকে বড়ো কয়েকটি ঝাঁকুনি দিল। অনুফা বিড়বিড় করে পাশ ফিরল। তার ঘুম ভাঙল না। দবির মিয়া বিছানা ছাড়ল রাত দুটার দিকে। শুয়ে থাকার কোন মানে হয় না। যে-কোন কারণেই হোক ঘুম চটে গেছে। সে কাতালায় পরপর দুটি সিগারেট শেষ করল। বাইরেউলপাথাল হাওয়া। খালি গায়ে থাকার জন্যে শীতশীত করছে। এরকম হওয়ায় বারান্দায় বিছানা পেতে জহুর ঘুমায় কী করে কে জানে? দিনকাল ভালো না। এরকম খোলামেলা ভাবে বারান্দায় ঘুমান ঠিক না। জহুরের শত্রুর তো অভাব নেই। কিন্তু জহুর যেটা মনে করবে, সেটাই করবে। অন্যের কথা শুনলে কি আর আজ এই অবস্থা হয়? দবির মিয়া আরেকটি সিগারেট ধরাল।

জহুরের ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু করবেটা কী? একটা লঞ্চের যোগাড় দেখার কথা ছিল, সেটা সম্ভব না। একা-একা লঞ্চ কেনা তার পক্ষে সম্ভব না। সফদর শেখের সঙ্গে কথা হয়েছিল, সে টাকা দিতে রাজি, কিন্তু জহুরকে রাখতে রাজি না।

বুঝেন তো দবির ভাই, নানান লোকে নানান কথা বলবে।

কী কথা বলবে?

সফদর শেখ তা আর পরিষ্কার করে বলে না, দাড়ি চুলকায়।

জহুর একটা নির্দোষ লোক, সেইটা জানেন আপনি সফদর সাব?

আরে ছিঃ ছিঃ, তা জানব না কেন? আমি কত আফসোস করলাম। এখন করি।

দবির মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, আফসোসে কোন ফয়দা হয় না।

ফয়দা হয় না ঠিকই, তবু আফসোস থাকাটা ভালো। লোকজনের তত আফসোস পর্যন্ত নাই। এই যে ছেলেটা আসল, কেউ কি বাড়িতে এসে ভালো-মন্দ কিছু বলেছে? না, বলে নাই। মানুষের কিছুই মনে থাকে না। চৌধুরী সাহেব তো ভালো মতেই আছেন। কয়েক দিন আগে ডিগ্রী কলেজের জন্যে অনেকখানি জমি দিলেন। নিজের পয়সার গার্লস স্কুলের একটা হোস্টল তৈরি করে দিলেন। বিরাট হলস্থুল। ময়মনসিংহের ডিসি সাহেব আসলেন। কত বড়ো বড়ো কথা; কর্মযোগী, নীরব সাধক, নিবেদিতপ্রাণ–দূর শালা।

দবির মিয়া কলতলা থেকে উঠে এসে বারান্দায় বসল। জহরকে কিছু একটাতে লাগিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়ে-শাদি দেওয়া দরকার। বিয়ে দেওয়াটাও তো মুশকিল। কে মেয়ে দেবে? দেশে মেয়ের অভাব নেই। কিন্তু খুন করে ছ-সাত বছর জেল খেটে যে-ছেলে এসেছে, তার জন্য মেয়ে নেই। চৌধুরী সাহেব অবশ্যি একটি মেয়ের কথা বলেন। সম্পর্কে তাঁর ভাতিজী। মেয়েটিকে দেখেছে দবির মিয়া। শ্যামলা রঙ, বেশ লম্বা। দেখতে-শুনতে ভালোই। কিন্তু জহরকে বলারই তার সাহস হয় না। পুরনো কথা সব ভুলে গিয়ে নতুন

করে সব কিছু শুরু করাই ভালো। বরফের মেশিনে ম্যানেজারীর চাকরিটা নিয়ে নিলে মন্দ কি?

বাহাদুর জেগে উঠেছে। বিকট চিৎকার শুরু করেছে অভ্যাস মতো। দবির মিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে প্রচণ্ড একটা চড় কল। কান্না থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অনুফা বলল, কেন বাচ্চা দুইটারে মার?

দবির মিয়া উত্তর দিল না।

বাচ্চা দুইটা তোমারে যমের মতো ডরায়।

দবির মিয়া তারও উত্তর দিল না। আবার বাইরে গিয়ে বসল। তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে দবির মিয়া কাশতে লাগল। নাহু, আবার বিয়ে করাটা ভুল হয়েছে। মস্ত বোকামি। অনুফার আগের পক্ষের ছেলে দুটি তার বাপের কাছে থাকবে, এরকম কথা ছিল। কিন্তু সাত দিন পার না হতেই বাবলু আর বাহাদুর এসে হাজির। তারা কাউকে কিছু না বলে আট মাইল রাস্তা হেঁটে চলে এসেছে। তাদের দ জনকে পাওয়া গেল নীলগঞ্জের বাজারে। কোথায় কার বাড়ি যাবে কিছু বলতে পারে না। শুধু জানেনীলগঞ্জে তাদের মা থাকে। দুটি যমজ ছেলে নিমাইয়ের মিষ্টির দোকানে বসে কাঁদছে শুনে দবির মিয়া কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেছে। তারপর মুখ গম্ভীর করে বাড়ি নিয়ে এসেছে। বাচ্ছা দুটি খালি হাতে আসে নি, প্যান্টের পকেট ভর্তি। করে তাদের মায়ের জন্যে কাঁচামিঠা আম নিয়ে এসেছে।

ছেলে দুটি বিন্দু। মহা বিচ্ছু। তাদের নানা খবর পেয়ে এসে নিয়ে গিয়েছিল। তিন দিন পরই রাত নটায় দু মূর্তি এসে হাজির। দবির মিয়া তক্ষুণি ফেরত পাঠাবার জন্যে ব্যবস্থা করল। বাদ সাধন টুনী।

না বাবা, থাকুক।

থাকুক মানে?

মায়ের সাথে থাকুক।

দবির মিয়ার বিরক্তির সীমা রইল না।

থাকার জায়গাটা কোথায়?

জায়গা না থাকলেও থাকবে। মাকে ছাড়া থাকতে পারে!

ধামড়া ধামড়া ছেলে, মাকে ছাড়া থাকতে পারে না–একটা কথা হল!

দবির মিয়া মহা বিরক্ত হল। কী যন্ত্রণায় বিরক্তির সঙ্গে-সঙ্গে টুনীর সাহস দেখেও সে অবাক হল। বাপের মুখে-মুখে কথা বলে, বেয়াদপির একটা সীমা থাকা দরকার।

দবির মিয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। খুট করে শব্দ হল একটা। দবির মিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বাবলু বের হয়ে আসছে।

সূচিপত্র

কী চাস তুই?

পেশাব করব।

শোয়ার আগে সারতে পারি না? বাঁদর কোথাকার। এক চড় দিয়ে দাঁত সবগুলো ফেলে দেব।

বাবলু বারান্দার এক কোণে প্যান্ট খুলে বসে রইল। দবির মিয়া আড়চোখে দেখল বাবলু ভীত চোখে বারবার দবির মিয়ার দিকে তাকাচ্ছে।

বারান্দায় বসে পেশাব করতে নিষেধ করি নাই?

বাবলু পাংশু মুখে উঠে দাঁড়াল।

পেশাব শেষ হয়েছে?

না।

শেষ কর।

বাবলু আবার বসল। দবির মিয়া বলল, স্কুলে যাস তো রোজা

যাই।

পড়াশোনা করিস তো ঠিকমতো?

হুঁ।

হুঁ আবার কি? বল জ্বি।

জ্বি।

পড়াশোনাটা ঠিকমতত করা দরকার।

বাবলু ঘরের দিকে যাচ্ছিল। দবির মিয়া হঠাৎ কী মনে করে মৃদু স্বরে বলল, এই বাবলু, বস দেখি এখানে।

বাবলু অবাক হয়ে পাশে এসে বসল।

কিচ্ছা শুনবি নাকি একটা? পিঠাপুলি রাক্ষসের কিচ্ছা?

স্তম্ভিত বাবলু কোনো উত্তর দিল না।

তুই আমারে ডরাস নি?

হুঁ।

হুঁ কিরে ব্যাটা? বল জ্বি।

জ্বি।

ডরাইস না। ডরের কিছু নাই। কিচ্ছা শুনবি?

হুঁ।

আবার হুঁ।

জ্বি। দবির মিয়া পিঠাপুলি রাক্ষসের কিচ্ছা শুরু করে।

অনুফা ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে দেখল, দবির মিয়া মৃদু স্বরে বাবলুকে কী যেন বলছে। গল্প নাকি? তার চার বছরের বিবাহিত জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা সে দেখে নি।

১৮. সাইফুল ইসলাম ভোরবেলা গলা সাধে

সাইফুল ইসলাম ভোরবেলা গলা সাধে। তার গলা ভালো। গানের মাষ্টারদের মতো কর্কশ এবং শ্লেষ্ম-জড়ান নয়। চৌধুরী সাহেব সাইফুল ইসলামকে সহ্য করতে না পারলেও ভোরবেলায় তার ঘরের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর কান উত্তর্ণ হয়ে থাকে। এবং নিজের মনেই বলেন–মন্দ না। আজও শুনলেন–

যা যারে কাগওয়া পিয়াকে পাস
কহিও খবরিয়া নৈ নহি ঘড়ি পল উন বিন...

চৌধুরী সাহেবের হাঁটার গতি কমে গেল। মনে-মনে বললেন-বাহু, ব্যাটা তো ভালো গাইছে। গান থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। খুট করে দরজা খুলে সাইফুল ইসলাম বের হয়ে এল। তার চোখ লাল। মুখ শুকিয়ে লম্বাটে হয়ে গেছে। সে দ্রুত এগিয়ে এল চৌধুরী সাহেবের দিকে। চৌধুরী সাহেব লক্ষ করলেন সে আসছে খালি-পায়ে।

মালিকুম চৌধুরী সাব।

ওলায়কুম সালাম।

আমি জানালা দিয়ে দেখলাম আপনি আসছেন। একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

তোমার শরীর খারাপ নাকি?

জ্বি। রাতে আমার ঘুম হয় না।

যা গরম, ঘুম না হওয়াই স্বাভাবিক।

চৌধুরী সাব, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বল।

একটু ভেতরে এসে যদি বসেন।

বল, এইখানেই বল।

সাইফুল ইসলাম বিড়বিড় করতে লাগল। চৌধুরী সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, বিষয়টা কী?

চৌধুরী সাব, গতকাল রাত্রে আমি জুমাঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম। মনসুরের যে কবর আছে তার ধার দিয়ে আসবার সময় একটা জিনিস দেখলাম।

কি জিনিস?

দেখলাম মনসুর বসে আছে কবরের পাশে। আমাকে দেখে সে হাসল।

কে বসে আছে বললে?

মনসুর।

কি ছাগলের মতত কথাবার্তা

সাইফুল ইসলাম বিড়বিড় করতে লাগল। চৌধুরী সাহেব ভারি গলায় বললেন, তুমি ডাক্তার-ফাক্তার দেখিয়ে ঘুমের ওষুধ-টষুধ খাও।

চৌধুরী সাহেব আর দাঁড়ালেন না। তাঁর অবশ্যি ব্যাপারটি ভালো করে শোনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় নেই। ময়মনসিংহ থেকে এসপি সাহেব এসেছেন গত রাতে। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ডাকবাংলায়। তাঁর খাবার-দাবার চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে যাচ্ছে। গত রাতে কথা হয়েছে চৌধুরী সাহেব সকালবেলা ডাকবাংলায় এসে চা খাবেন। দেরি করা যায় না। এসপি সাহেব লোকটিকে একটু কড়া ধাঁচের বলে মনে হয়েছে। সিএসপি অফিসারদের মতো। কিন্তু লোকটি দারোগা থেকে এসপি হয়েছে। এরা ভোঁতা ধরনের হয়ে থাকে, কিন্তু এ সেরকম নয়।

এসপি সাহেব একটা লুঙ্গি এবং হাতকাটা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় চেয়ারে, বসেছিলেন। টুর করতে আসা এসপি জাতীয় অফিসাররা লুঙ্গি পরে বসে থাকলে মানায় না। চৌধুরী সাহেব হাসিমুখে বললেন, কখন উঠলেন স্যার?

সকালেই উঠেছি।

রাতে ঘুম ভালো হয়েছিল?

হ্যাঁ।

খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হয় নাই তো স্যার?

খানিকটা হয়েছে। পোলাওটোলাও এখন খেতে পারি না। ইনডাইজেশন হয়।

স্যার, এখন থেকে সাদা ভাত পাঠাব।

ভাত পাঠানর তো আর দরকার নেই। আমি এগারটার ট্রেনে চলে যাচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব অবাক হয়ে বললেন, রাত্রে আপনার জন্যে একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

না, রাত্রে থাকব না।

তদন্ত শেষ হয়ে গেছে নাকি স্যার?

কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব। পোস্ট মার্টেম রিপোর্টটা দেখলাম। নরম্যাল ডেথ।

এসপি সাহেব চায়ে চুমুক দিতেদিতে বললেন, দেশে চোর-ডাকাতের সংখ্যা কচুগাছের মততা বাড়ছে। এরা কিভাবে মরল, সেই সব নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। আমি তো ভেবেছিলাম মিছিলটিছিল হবে, থানা ঘেরাওটোও হবে।

নীলগঞ্জ খুব ঠাণ্ডা জায়গা স্যার।

তাই দেখলাম। ঠাণ্ডা জায়গা এক বার গরম হয়ে গেলে কিন্তু মুশিবত হয়।

এসপি সাহেব সঙ্গের পিয়নটিকে সিগারেট দিতে বললেন। চৌধুরী সাহেব লক্ষ করলেন সাধারণ দেশী সিগারেটের একটি প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এর মানে কী? তিনি নাস্তার সঙ্গে দু প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ দিয়ে দিয়েছেন। সিগারেট মেরে দিচ্ছে নাকি? কী সর্বনাশ! ব্যাপারটা খোলাসা হওয়া প্রয়োজন। সরাসরি জিজ্ঞেস কাটা ঠিক হবে কিনা চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন না। এসপি সাহেব হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, আমি একটা বেনামী চিঠি পেয়েছি।

চৌধুরী সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে মনসুর নামের লোকটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বেনামী চিঠির কোনো গুরুত্ব আমি দিই না।

চিঠিটা একটু দেখব স্যার?

না। আপনি দেখবেন কেন?

দেখলে বুঝতে পারতাম কে লিখেছে?

তার কোন দরকার নেই।

চৌধুরী সাহেব দেখলেন দবির মিয়া হনহন করে আসছে। তিনি বললেন, দবির মিয়াকে আসতে বলেছেন নাকি স্যার?

দবির মিয়া কে?

মনসুর থাকত যার বাড়িতে।

হ্যাঁ, বলেছি। আপনি এখন তাহলে উফ চৌধুরী সাহেব। আর শোনেন, দুপুরে ভাত পাঠাবেন না।

চৌধুরী সাহেব অস্বস্তি নিয়ে উঠে পড়লেন। সিগারেটের কথাটা তাঁর আর জিজ্ঞেস করা হল না। সাইফুল ইসলাম গলা সাধছে।

যা যারে কাগওয়া, পিয়াকে পাস।
কহিও খবরিয়া চৈন নহি ঘড়ি পল উন বিন...।

ব্যাটা গায় মন্দ না। দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে। তিনি দাঁড়ালেন না, বাড়ি চলে এলেন। বসার ঘরে দু-তিন জন লোক বসে আছে। নিশ্চয়ই কোনো দরবাররবার। চৌধুরী সাহেব বলে দিলেন তাঁর শরীর ভালো নয়। এক জনকে পাঠালেন দবির মিয়ার দোকানে, অবশ্যি যেন দবির তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

মনসুর আলি আপনার দোকানে কাজ করত।

জ্বি স্যার।

সে যে চোর, সেটা জানতেন?

জ্বি না। পরে জানলাম।

মনসুর ধরা পড়ার পরে চুরি ডাকাতি শুনলাম বন্ধ।

জি স্যার, এখনো হয় নাই।

দারোগা সাহেবের কাছে শুনলাম আপনার ছোট ভাই এক জন এসেছে।

ভাই না স্যার, আমার শ্যালক।

সে এখন করছে কী?

দবির মিয়া কপালের ঘাম মুছে শুকনো গলায় বলল, সে একটা নির্দোষী লোক। লোকজনের ষড়ুযন্ত্র এই অবস্থা স্যার।

এসপি সাহেব কিছু বললেন না। দবির মিয়া বলল, ছেলেটার জীবনটা নষ্ট হয়েছে স্যার। শুধু তার একার না, আমারও নানান ঝামেলা হচ্ছে। বড় মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না।

মেয়ের বিয়ের সাথে এর কী সম্পর্ক।

যে বাড়িতে এমন খুন-খারাবি করার লোক আছে সে বাড়িতে বিয়ে-শাদি কেউ করতে চায় না।

এসপি সাহেব আচমকা প্রসারে চলে গেলেন।

এই চিঠিটা কি আপনার শালার লেখা?

দবির মিয়া অবাক হয়ে চিঠিটা পড়ল।

মাননীয় এসপি সাহেব সমীপেবু,

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত বুধবার দিবাগত রাত্রে নীলগঞ্জ থানায় মনসুর আলি নামক এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুন করা হইয়াছে। এই বিষয়ে আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। নচেৎ ফল খারাপ হইবে। আমরা ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করি না। থানা পুলিশকে নীলগঞ্জের লোকেরা ভয় পায় না। পূর্বেও এই অঞ্চলে এই জাতীয় অন্যায় হইয়াছে। থানার যোগসাজসে নিরাপরাধ ব্যক্তিকে খুনের দায়ে জেল খাটিতে হইয়াছে।

দীর্ঘ চিঠি। দবির মিয়া চিঠিটা দু বার পড়ল। এসপি সাহেব আবার বললেন, চিঠিটা কি আপনার শালার লেখা?

স্যার বলতে পারলাম না। তার হাতের লেখা আমি চিনি না। তবে...?

তবে কি?

সে এরকম চিঠি-ফিঠি লিখবে না স্যার। সে গোঁয়ার ধরনের।

দবির মিয়া অত্যন্ত চিন্তিত মুখে দোকানে গেল। বরকত আলি কাশবাক্স সামনে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি যেন দোকানটা তারই। সে টেনেটেনে বলল, আজকেও আসতে দেরি করছেন। সকাল সকাল দোকান খোলা দরকার।

দবির মিয়া জবাব দিল না।

চাইর জন কাস্টমার ফিরত গেছে। আমি বলছি ঘন্টাখানিক পরে আসতে।

ভালো করছেন।

কাস্টমার হইল আপনের হাতের লক্ষ্মী। কাস্টমার ফিরত যাওয়া খুব অলক্ষণ।

দবির মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার কাজ শেষ হয়েছে?

কোন কাজের কথা কন?

দাবোগা সাহেবের সাথে দেখা করার কথা ছিল যে।

ও, সেইটা। ওসি সাহেব চার-পাঁচ দিন পরে যাইতে কইছেন। এখন থানায় খুব ঝামেলা যাইতেছে।

আরো চার-পাঁচ দিন থাকবেন তাহলে?

জ্বি।

আমার এখানে না, অন্যখানে থাকেন গিয়ে।

বরকত আলি স্তম্ভিত হয়ে গেল।

যামু কই আমি ভাইসাব?

যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান।

বিস্মিত বরকত আলি চা খেতে গেল নাড়ুর দোকানে। চা খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার।

বেলা প্রায় দশটা হয়েছে। সিক্সটিন ডাউনের আসবার সময়। নান্টুর দোকানে কামারদের ভিড় এই সময় সবচেয়ে বেশি। কাজেই সাইফুল ইসলাম যখন এসে বলল, নান্টু, একটা জরুরী কথা আছে আমার। একটু বাইরে আসা তখন সেসঙ্গত। কারণেই বিরক্ত হল।

পরে আসেন।

পরে না, এখন।

কি, টাকাপয়সা দরকার?

সাইফুল ইসলামকে নান্টুর কাছ থেকে প্রায়ই টাকাপয়সা ধার করতে হয়।

না, টাকাপয়সা না।

নান্টু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল।

বলেন, কি বিষয়?

সাইফুল ইসলাম থেমেথেমে বলল, আমি জুমাঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি মনসুর তার কবরের পাশে বসে আছে।

কারে দেখছেন?

মনসুর। মনসুর আলিকে।

নান্টু অবাক হয়ে ঢাকাল, এই সব কী কন!

সত্যি। আত্মার কসম।

সাইফুল ইসলাম নান্টুর হাত চেপে ধরল। গাড়ি আসবার সময় হয়ে গেছে। এ সময় কীসব বাড়তি ঝামেলা।

আসেন ভিতরে, চা খান।

সাইফুল ইসলাম চা খাবার জন্য ভেতরে গেল না। এসপি সাহেবের সম্মানে গান-বাজনার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার। এখনন তার কিছুই করা হয় নি। গানবাজার আয়োজন কোথায় হয়েছে তা জানা দরকার। ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন, কিন্তু থানায় যেতে তার সাহসে কুলাচ্ছে না।

চৌধুরী সাহেব খবর পেলেন এসপি সাহেব এগারটার গাড়িতে যাচ্ছেন না। রাতে গান-বাজনার আয়োজন করা হয়েছে। চৌধুরী সাহেবের বাড়িতেই গান-বাজনা হবে। সময় অল্প। স্থানীয় বিশিষ্ট সব লোকজনদের খবর দিতে হয়। চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

১৯. জহুরের শার্টের পকেটে

জহুরের শার্টের পকেটে কিছু ভাঙতি পয়সা ছিল। সিগারেটের দাম দেবার সময় জহুরের মনে হল পয়সার সঙ্গে একটা কাগজের নোটও যেন রয়ে গেছে। সত্যি তাই। ছোটখাটো কোন নোট না, এক শ টাকার একটা নোট। দুলাভাই কোনো এক ফাঁকে পকেটে রেখে দিয়েছেন বলাই বাহুল্য। এর দরকার ছিল কি? ডেকে হাতে দিয়ে দিলেই হত। সম্ভবত দিতে লজ্জাবোধ করেছেন। জাবোধ করার কী আছে এর মধ্যে?

জহুর একটি সিগারেটের বদলে দু প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেলল। তাতেও টাকার ভাঙতি হয় না। জহুর বলল, টাকাটা থাক তোমার কাছে। মাঝে মাঝে আমি সিগারেট নেব। এক সময় এক শ টাকার সিগারেট নেওয়া হবে।

পান-বিড়ির দোকানের ছেলেটির বয়স অল্প। সে এরকম অদ্ভুত প্রস্তাব এর আগে শোনে নি। জহুর বলল, ঠিক আছে?

জি আইচ্ছা।

সন্ধ্যা হয়-হয় অবস্থা। জহুর স্টেশনের দিকে যাবে বলে ঠিক করল। হেঁটে বেড়াবার জন্য জায়গাটা চমৎকার। সারি সারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ আছে। ফুল ফুটেছে। নিশ্চয়ই।

মামা।

জহুর তাকিয়ে দেখল টুনী সেজগুজে যাচ্ছে যেন কোথায়।

যাস কোথায়?

গান গাইতে যাই মামা। গানের আসর হচ্ছে একটা।

দুলাভাই জানেন তো?

হুঁ, জানেন। বাবাই যেতে বলল।

একা-একা যাচ্ছি?

একা যাচ্ছি না। তুমিও যাচ্ছ আমার সাথে। তোমাকে ঘর থেকে দেখেই বের হয়েছি। নয়ত বাবার সঙ্গে যাওয়া লাগত। বাবার সঙ্গে যেতে ভালো লাগে না।

আসটা হবে কোথায়?

বলে তো তুমি আবার যেতে চাইবে না।

চৌধুরী সাহেবের বাড়ি?

হুঁ। তোমাকে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। পৌছে দিয়ে চলে আসবে।

ঠিক আছে।

জহুর হাঁটতে শুরু করল। টুনী তরল গলায় বলল, শার্টের পকেটে টাকা পেয়েছ মামা?

পেয়েছি।

বাবা আমার হাতে দিয়ে বলেছেন তোমার পকেটে রাখতে।

জহুর চুপ করে রইল।

হাতে দিয়ে দিলেই হয়। তা দেবেন না। শুধুশুধু ঢং।

জহুর আড়চোখে কাল টুনীর দিকে। বড়োআপার সাথে টুনীর চেহারার খুব মিল। হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠতে হয়। কথাও বলে বড়োআপার মতো।

বাবার দোকানে আবার চুরি হয়েছে, জান নাকি মামা?

জহুর আশ্চর্য হয়ে বলল, কই, জানি না তো।

জানবে কোত্থেকে? সে কাউকে বললে তবে তো জানবে?

তুই জানলি কীভাবে?

ছোটমার সঙ্গে গুজগুজ করছিলেন। আড়াল থেকে শুনলাম।

কী চুরি হয়েছে?

তা জানি না। বাবার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। ডাল কিনে রেখেছিলেন, ইঁদুর নাকি বস্তা ফুটো করে কী সব করছে।

টুনী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি ভেবেছিলাম তুমি আসলে সব অন্য রকম হবে। কিন্তু তুমি আর আগের মতো নেই।

জহুর কথা বলল না।

তুমি তো দেখি দিনরাত বসেই থাক। কি ভাব বসেবসে?

কিছু ভাবিটাবি না।

কেন ভাব না? তোমাকে ভাবতে হবে।

ভাবতে হবে কেন?

টুনী চুপ করে গেল।

চৌধুরী সাহেবের বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। স্থানীয় লোকজন সবাই মনে হয় এসে পড়েছে। গরমের জন্যেই হয়তো বারান্দায় চেয়ার সাজান হয়েছে। লোকজন বসে আছে চেয়ারে। জহুর ঘরের ভেতর ঢুকল না। টুনী মৃদু স্বরে বলল, তুমিও আস না মামা।

না, তুই যা।

জহুর স্টেশনের দিকে রওনা হল। বড়ো রাস্তার শেষ মাথায় এসে সে আরেকটি সিগারেট ধরাল। সাইফুল ইসলামকে এই সময় দেখা গেল দ্রুত পায়ে আসছে। তার হাতে তবলা এবং বাঁয়া। পোশাক-আশা আগের মতো ফিটফাট নয়। পাঞ্জাবিটাও ইস্ত্রি নেই। গা থেকে সেন্টের গন্ধও আসছে না। সাইফুল ইসলাম জহুরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, জ ভাই, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

বলেন।

আজ তো সময় নাই। রাত্রে এক বার যার আপনার কাছে।

ঠিক আছে, আসবেন।

বিশেষ একটা জরুরী কথা।

ঠিক আছে।

আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাই।

ঠিক আছে। এখন তাহলে যান, আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

জ্বি, দেরি হচ্ছে। তা ইয়ে, টুনী কি এসেছে চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে?

এসেছে।

সাইফুল ইসলাম খানিক ইতস্তত করে বলল, আঙ্গুরীবালার মতো গলা টুনীর। আমি তাকে গান শিখাতে চাই জহুর ভাই। টাকাপয়সা কিছু দিতে হবে না।

সাইফুল ইসলাম বায়াটা নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে লাগল।

এইটাই কি আপনার জরুরী কথা নাকি?

জ্বি-না।

আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাবে।

না, দেরি আর কি?

সাইফুল ইসলাম একটা সিগারেট ধরাল। ক্লান্ত স্বরে বলল, দুই রাত ধরে আমার ঘুম হয় না।

জহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। অন্ধকার হয়ে গেছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আপনি বাসায় থাকবেন জহুর ভাই?

আমি থাকব।

এসপি সাহেব মৃদু গলায় বললেন, তুমি মা আরেকটি গান গাও।

আর কোন গান তো জানি না।

এসপি সাহেব বড়ই অবাক হলেন, একটি গানই জান?

জ্বি।

আশ্চর্য।

চৌধুরী সাহেব নিজেও খুব অবাক হয়েছেন। গান-বাজনা তিনি বিশেষ বোঝন না, তবু তাঁর মনে হল এই মেয়েটির মতো সুন্দর গলা তিনি বহু দিন শোনেন নি। এসপি সাহেব বললেন, গানটি তুমি আরেকবার গাও। নাম কি তোমার মা?

টুনী।

দবির মিয়া বলল, ওর ভালো নাম সুলতানা খানম।

আপনার মেয়ে বুঝি?

জ্বি স্যার।

এই মেয়ে খুব নাম করবে। আপনি দেখবেন, নাম করবে।

দবির মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলল, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে গান-বাজনা আর কী করবে? এই সব আমাদের জন্যে না স্যার।

এসপি সাহেব রাগী চোখে তাকালেন। কঠিন ও তীক্ষ্ণ চাউনি।

২০. খয়েরী রঙের একটা শাড়ি

মিনু ভাবী খয়েরী রঙের একটা শাড়ি পরেছেন। লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখখানি করুণ দেখাচ্ছে। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, চা খাবেন জহুর ভাই?

জ্বি-না।

বৃষ্টি হবে আজ রাতে। ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু জহুর উঠল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগল। চারদিকে মেয়েলি স্পর্শ আছে। দেখেই বোঝা যায়, এখানে বহুদিন ধরেই কোন পুরুষমানুষ থাকে না।

আপনার চলে কীভাবে ভাবী?

চৌধুরী সাহেব আমার জন্যে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তাই নাকি?

হুঁ। আমার জন্যে অনেক করেছেন।

জহুর মৃদু হাসল। মিনু নরম স্বরে বলল, তাঁর সাহায্য নিতে ইচ্ছা হয় নি, কিন্তু না নিয়েও কী করব বলেন?

তা ঠিক।

মিনু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

ঝড়-বৃষ্টি হবে, আমি উঠি ভাবী।

বসেন না। আরেকটু বসেন।

জহুর ইতস্তত করে বলল, আমার এ রকম আসা ঠিক না, লোকজন নানান কথা বলতে পারে।

বলুক। আমি এখন এই সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। কত কথা রটল আমাকে নিয়ে, বুঝলেন জহুর ভাই। বিধবা মেয়েদের বড়ড়া কষ্ট।

জহুর উঠে দাঁড়াল।

ছাতা এনেছেন?

জ্বি-না।

আমারটা নিয়ে যান। বৃষ্টি আসবে।

না, থাক।

থাকবে কেন জহুর ভাই? নিয়ে যান।

হারিকেন হাতে মিনু চাপা স্বরে বলল, শহরে একটা ঝামেলা হচ্ছে, সেটা তো জানেন। একটা লোককে মেরে ফেলেছে।

জানি।

জহুর ভাই, এই সব নিয়ে আপনি কোনো কথাবার্তা বলবেন না।

এই কথা বলছেন কেন?

আপনি তাহলে আবার অসুবিধায় পড়বেন। জেলে-টেলে দিয়ে দেবে।

জহুর অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমাকে জেলে দিলে কারো তো কোনো ক্ষতি নেই ভাবী।

মিনু সে-কথার জবাব দিল না। হারিকেনটা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হবে। জহুর একটা সিগারেট ধরিয়ে হালকা গলায় বলল, যাই ভাবী। মিনু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বাতাস দিতে শুরু করেছে। ভেজা গন্ধ আসছে। দূরে কোথায়ও বৃষ্টি নেমেছে বোধহয়। জহুর মৃদু স্বরে বলল, যাই আজ।

মিনু কিছু বলল না।

২১. সাইফুল ইসলাম রাত এগারটার সময়

সাইফুল ইসলাম রাত এগারটার সময় এসে উপস্থিত। জহুর মশারি ফেলে ঘুমাবার আয়োজন করছিল। সাইফুল ইসলামকে দেখে অবাক হয়ে বেরিয়ে এল।

জহুর ভাই, আমি বলেছিলাম–আসব।

এত রাতে আসবেন ভাবি নি।

নান্টুর দোকানে চা খাচ্ছিলাম। এত রাত হয়েছে টের পাই নাই।

ব্যাপার কি?

সাইফুল ইসলাম ইতস্তত করতে লাগল। জহুর বলল, বসেন, ঐ বেঞ্চিটাতে বসেন।

সাইফুল ইসলাম বসল না। জহুর বলল, বলেন শুনি, কি ব্যাপার।

আপনি বুঝি বারান্দাতে ঘুমান?

হুঁ।

সাপখোপের ভয় আছে কিন্তু। সময়টা খারাপ।

জহুর সিগারেট ধরাল।

নিন, সিগারেট নিন।

সাইফুল ইসলাম সিগারেট নিল। মৃদুস্বরে বলল, সিগারেট খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি জহুর ভাই। খরচে পোষায় না। টাকাপয়সার খুব টানটানি আমার।

ছাড়তে পারলে তো ভালোই।

পুরাপুরি ছাড়তে পারি নাই। মাঝেমাঝে খাই।

জহুর বলল, কি বলতে এসেছেন, বলেন।

সাইফুল ইসলাম মৃদু স্বরে বলল, আসেন, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলি।

জহুর রাস্তায় নেমে এল। এতটুকু বাতাস নেই কোথাও। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। মেঘ-বৃষ্টি হবে এমন লক্ষণও নেই। ঝকঝক করছে আকাশ। সাইফুল ইসলাম চাপা গলায় বলল, মনটা খুব খারাপ জহুর ভাই। একটা মানুষ মেরে ফেলেছে, কিন্তু কেউ একটা কথা পর্যন্ত বলছে না।

কাকে মেরে ফেলেছে?

মনসুর। মনসুর আলি। পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

সাইফুল ইসলাম রুমাল বের করে ঘাড় মুছতে লাগল। থেমে থেমে বলল, পরশু রাতে মনসুর আলিকে দেখলাম। মাথা নিচু করে কবরের পাশে বসে ছিল।

কাকে দেখলেন?

মনসুর আলিকো কালকেও দেখেছি।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কালকে গরমের জন্যে মাঠের মধ্যে বসে ছিলাম। তখন দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম। হাতে চটের একটা বস্তা ছিল।

জহুর দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। তারপর সিগারেট ধরাল।

নিন, আরেকটা সিগারেট নিন।

সাইফুল ইসলাম হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিয়ে পকেটে রেখে দিল।

কাল সকালে নাশতার পরে খাব।

জহুর মৃদু স্বরে বলল, যান, বাড়িতে গিয়ে ঘুমান। সকালে কথা বলব।

আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই, না?

জহুর জবাব দিল না।

আপনি আমার সঙ্গে যদি আসেন তাহলে নিজের চোখে দেখবেন। আসেন জহুর ভাই।

আজকে আর যাব না কোথায়ও।

জহুর ভাই, একা-একা তো বাড়ি যেতে পারব না। ভয় লাগে। একটু এগিয়ে দেন।

জহুর হাঁটতে শুরু করল। সারা পথে আর কোনো কথাবার্তা হল না। কবরখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় সাইফুল ইসলাম মৃদু স্বরে বলল, আজকে নাই।

জহুর বলল, এখন যেতে পারবেন একা-একা?

জ্বি।

যান, ঘুমিয়ে পড়েন গিয়ে। সকালে কথা বলব।

আমার সকালে ঘুম আসে না।

কী করেন এত রাত পর্যন্ত?

চিঠি লেখি।

রোজ চিঠি লেখেন?

সাইফুল ইসলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

জহুর বাড়ি ফিরে দেখে দবির মিয়া বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

এত রাতে তুমি গিয়েছিলে কোথায়?

সাইফুল ইসলাম এসেছিল, ওর সঙ্গে একটু গিয়েছিলাম।

বিছানপত্র এইভাবে ফেলে রেখে গেছ? চোরের উপদ্রব।

জহুর চুপ করে রইল। দবির মিয়া রাগী স্বরে বলল, ঐ হারামজাদা সাইফুল ইসলাম ঘুরঘুর করছে কী জন্যে?

কি জানি দেখেছে।

দেখবে আবার কী? শালা চালবাজ। আমার সাথে ফাজলামি করে।

কী করেছে আপনার সাথে?

বলে বিনা পয়সায় গান শিখাবে। মিয়া তানসেন এসেছে। চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব।

জহুর ঘুমাবার আয়োজন করল। দবির মিয়া বাতি নিভিয়ে দিল, কিন্তু সেই রইল বাইরে। জহুর বলল, শুয়ে পড়েন গিয়ে দুলাভাই।

দবির মিয়া সিগারেট ধরাল। ক্লান্ত স্বরে বলল, রাতে বারান্দায় ঘুমানটা ঠিক না। সময় খারাপ।

জহুর চুপ করে রইল। দবির মিয়া সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ক্রমাগত কাশতে লাগল। জহুর বলল, দুলাভাই, আপনি কি কিছু বলবেন?

হুঁ।

জহুর মশারি থেকে মাথা বের করল।

ব্যাপার কি দুলাভাই?

আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দোকানে চুরি হয়েছে আরেক বার।

শুনেছি।

শুনে মানে, কার কাছ থেকে শুনেছ?

এত লুকানর কী আছে এর মধ্যে?

আছে, আছে, তুমি বুঝবে না।

থানার পেটাঘড়িতে বারটার ঘন্টা পড়ল। দবির মিয়া বলল, চৌধুরী সাহেব যে কাজটা দিতে চায়, সেই কাজটা তুমি নেও জহুর। পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ঠিক।

জহুর বিছানা থেকে বের হয়ে বেধির ওপর বসল। দবির মিয়া বলল, আমরা অনেক কিছু হজম করি। টিকে থাকার জন্য করতে হয়। কি, ঠিক না।?

জহুর জবাব দিল না। দবির দ্বিতীয় একটি সিগারেট ধরিয়ে ধীর স্বরে বলল, চৌধুরী সাহেব এখন মনে হয় কিছুটা লজ্জিত। তোমার খোঁজখবর করছে এই জন্যই। সুযোগটা নেওয়া দরকার, বুঝলে? আর ঐ যে একটা মেয়ের কথা বলেছিলেন, দেখলাম মেয়েটাকে। বেশ ভালো মেয়ে। ম্যাট্রিক সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করেছে। কলেজে আর ভর্তি হয় নাই। একটু খাটো, কিন্তু ফর্সা গায়ের রঙ। চুলও দেখলাম। চৌধুরী সাহেব বলেছেন বিয়ের খরচপাতি দেবেন।

তার সাথে আপনার আজকেই কথা হয়েছে?

হুঁ। টুনীরবিয়েরও একটা প্রস্তাব দিলেন। ছেলেরকাপড়ের ব্যবসা, সৈয়দংশ। গ্রামে দোতলা পাকা দালান।

চৌধুরী সাহেবের আত্মীয়?

না, তবে চেনা-জানা। মঙ্গলবার মেয়ে দেখতে আসবে।

ছেলের পড়াশুনা কেমন?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

পড়াশুনা তেমন কিছু না। সব মিলিয়ে কি পাওয়া যায়। তবে ছেলে দেখতে। সুন্দর। লম্বা-চওড়া।

ভালোই তো।

ছেলের টাকা আছে। টাকাটা খুব দরকারী জিনিস। টাকা থাকলে সব কিছু হয়। যখন বয়স কম থাকে, তখন মনে হয় টাকাটা বড়ো কিছু না, কিন্তু যখন বয়স বেশি হয়, সত্যি কথাটা বোঝা যায়।

জহুর মৃদু স্বরে বলল, টুনীর সম্ভবত গান-বাজনার শখ।

দবির মিয়া উঠে পড়ল। জহুর অন্ধকারে বেঞ্চির ওপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইল।

২২. নীলগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে

বরকত আলি রাতে নীলগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঘুমিয়েছিল। সকালবেলা সে জেগে উঠে দেখে তার চামড়ার ব্যাগটি চুরি গেছে। তার পাঞ্জাবির পকেটে একুশ টাকা চল্লিশ পয়সা ছিল, সেগুলোও নেই। সে তার দুঃখের কথা বলার জন্যে দবির মিয়ার বাড়ি গেল। দবির মিয়া তাকে হাঁকিয়ে দিল।

বরকত আলিদুপুর পর্যন্ত নেজামুদ্দিনের ডিসপেনসারিতে বসেরইল। নেজামুদ্দিন এক জন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তার সঙ্গে বরকত আলির বেশ খাতির হয়েছিল। নেজামুদ্দিন তিন ফাইল কানপাকার ওষুধ কিনেছিল, বরকত আলি তার কোন দাম নেয় নি। কিন্তু আজ বরকত আলির দুঃখের গল্প শুনে নেজামুদ্দিনের মুখ লম্বা। হয়ে গেল। সে বরকত আলিকে বসিয়ে রেখে দুপুরে ভাত খেতে গেল। ফিরল বিকালে।

বরকত আলি চোখে অন্ধকার দেখছিল। সে ক্ষুধা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আজ সারা দিন তার তিন কাপ চা, দুটি টোষ্ট বিসকিট ছাড়া কিছুই খাওয়া হয় নি।

সন্ধ্যার আগে-আগে সে থানার ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা হল না। তাঁর শরীর বেশি ভালো নয়। তিনি থানায় আজ আর আসবেন না। সেকেণ্ড অফিসার তাকে এক কাপ চা খাওয়ালেন এবং বললেন খামোকা ঘোরাঘুরি না করে বাড়ি ফিরে যেতে।

রাতের বেলা বরকত আলিকে দেখা গেল ছেলের কবরের কাছে উবু হয়ে বসে আছে।

সাইফুল ইসলাম নান্টুর দোকানের চা খেয়ে ফিরবার পথে তাকে দেখতে পেল। সে চেচিয়ে উঠল, কে, কে? মনসুর নাকি? এ্যাই–এ্যাই।

বরকত আলি উঠে দাঁড়াল। ধরা গলায় বলল, জি আমি। আমি বরকত আলি।

এইখানে কী করেন আপনি?

বরকত আলি বলল, আজকে আমার খাওয়া হয় নাই সাব।

খাওয়া হয় নাই?

জ্বি না ভাইসাব। আমার জিনিসপত্র সব চুরি গেছে। একটা পয়সাও নাই সাথে।

আরে, এ তো সিরিয়াস মুসিবত।

এই বয়সে খিদার কষ্ট সহ্য হয় না ভাইসাব।

হুঁ, না হওয়ারই কথা।

সাইফুল ইসলাম কুঞ্চিত করল। মসজিদ থেকে আবার ওয়াজ শুরু হয়েছে, নবীজীর সাফায়াত পাওয়া সহজ না, এই কথাটা মনে রাখবেন। দুনিয়াদারী কঠিন। জায়গা ভাই সব। বড় কঠিন স্থান। দীন-দুনিয়ার মালিক গাফুরুর রহিম ইয়া জাল জালাল ওয়াল্ ইকরাম এরশাদ করেছেন...

সাইফুল ইসলাম তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। সেই রাত্রেই নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের কাছে তিন পাতার একটা চিঠি লিখল। চিঠির শুরু এরকম।

ওসি সাহেব, আপনার কি ধারণা নীলগঞ্জের অধিবাসীরা ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে। সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হইয়া গিয়াছে। খুনের দায়ে এখন হাতকড়া পরিবার জন্যে তৈরী হওয়ার সময় আসিয়াছে। শালা, তুই কি ভাবিয়াছিস...

২৩. অঞ্জু স্কুলে গিয়েছে

ভাত বেড়ে দিচ্ছি অনুফা। অঞ্জু স্কুলে গিয়েছে। টুনীর শরীর খারাপ, শুয়ে আছে। জহুর অস্বস্তি বোধ করছিল। অনুফা মৃদু স্বরে বলল, পেট ভরে খান ভাইসাব।

জহুরের মাথা আরো খানিকটা নিচু হয়ে গেল। অনুফার সঙ্গে দেখা হলেই সে কোনো-একটা বিচিত্র কারণে লজ্জা বোধ করে। অনুফা ডালের বাটি এগিয়ে দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, টুনীর গান-বাজনার শখ। সৈয়দ বাড়িতে বিয়া হইলে কিছুই হইত না। আপনে আপনার ভাইরে কম।

জহুর বলল, জ্বি, বলব।

আমার কথা শুনে না। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ।

জ্বি, বলব আমি।

জহুর লক্ষ করল অনুফা দারুণ অসুস্থ। গালটাল ফুলে আছে। চোখ রক্তাভ। দুলাভাই বোধহয় চিকিৎসা করাচ্ছে না ঠিকমত। পানি পড়াট খাওয়াচ্ছে কিংবা হোমওপ্যাথি করছে। অনুফা ইতস্তত করে বলল, আর একটা কথা ভাইসাব। হনলাম আপনে মিনুর কাছে মাঝেমধ্যে যান। আর যাইয়েন না।

জহুর ভাত মাখা বন্ধ করে অনুফার দিকে তাকাল। অনুফা বলল, আপনে রাগ। কইরেন না ভাইসাব।

না, রাগ করি নি। দুলাভাই কি আপনাকে বলেছেন আমাকে এই সব বলার জন্যে?

জ্বি-না, আপনের দুলাভাই আমারে কিছু কইতে কয় নাই। নিজের থাইক্যা কইলাম।

আচ্ছা ঠিক আছে, আর যাব না।

মাইয়াটার খুব বদনাম। বিধবা মাইনষের খুব অল্প বদনাম হয়। আর চাইরা ভাত নেন।

২৪. সন্ধ্যাবেলা মেয়ে দেখতে আসবার কথা

সন্ধ্যাবেলা মেয়ে দেখতে আসবার কথা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সন্ধ্যার আগে আগে চৌধুরী সাহেব এসে হাজির। দবির মিয়া অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চৌধুরী সাহেব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসার ঘরের চেয়ারে বসে রইলেন।

ছেলে নিজেই এল মেয়ে দেখতে। মুররির মধ্যে ছেলের বড়োভাই। ছেলে দেখে জহুর বেশ অবাক হল। সুন্দর চেহারা। কথায়বার্তায়ও চমৎকার। চুনীকে দেখে। ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকল না বা বন্ধুবান্ধবকে খোঁচা দিয়ে ভ্যাভ্যাক করে হাসল না। বেকুবের মতো জিজ্ঞেস করল না, এক সের বেগুন ডুবাতে কত সের পানি লাগে?

টুনী চলে যাবার পর ছেলের বড়ভাই বললেন, চৌধুরী সাহেব, মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব বললেন, আপনার পছন্দ হয়েছে বুঝলাম, ছেলের মত জিজ্ঞেস করেন।

হয়েছে, ছেলের হয়েছে। এখন আপনাদের যদি ছেলে পছন্দ হয় তাহলে দিনতারিখ করেন।

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, আমাদের একটা শর্ত আছে। যদি শর্তে স্বীকার হন, তাহলেই সম্বন্ধ হবে।

দবির মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ছেলের বড়োভাই নড়েচড়ে বসল।

শর্তটা কি?

মেয়ে বড়ো গায়িকা। তার গান শুনলে বুঝবেন। শর্ত হল মেয়েকে গান-বাজনা শিখাতে হবে। কি বল দবির?

দবির মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। চৌধুরী সাহেব বললেন, তোমার মেয়েকে ডেকে আন তো দবির। খালিগলায় একটা গান শুনিয়ে দিক।

টুনীকে আবার আসতে হল। গান শোনাতে হল। ছেলের বড়োভাই বললেন, আমাদের সাধ্যমত আমরা চেষ্টা করব।

কথা দিচ্ছেন তো?

জ্বি, কথা দিলাম।

তাহলে হাত তোলেন, মুনাজাত হোক।

বিয়ের তারিখ হল আষাঢ় মাসে। ছেলেদের দাবিদাওয়া কিছু নেই। মেয়েকে খুশি হয়ে যদি কিছু দেন, তাহলে সেটা তাদের ইচ্ছা।

দবির মিয়া চৌধুরী সাহেবকে এগিয়ে দিতে গেল। চৌধুরী সাহেব বললেন, ছেলে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

জ্বি, পছন্দ হয়েছে।

পছন্দ হওয়ারই কথা। বনেদি ঘরের ছেলে। এদের আচার-ব্যবহারই অন্য রকম।

তা ঠিক।

আর ছেলের পড়াশোনার কথা যা বলেছিলাম, তা ঠিক না। আই এ পাস করেছে।

দবির মিয়া অভিভূত হয়ে পড়ল। চৌধুরী সাহেব বললেন, আমি জহুরের চাকরিটার কথা বলে রেখেছি, জহুরকে লাগিয়ে দাও।

দবির মিয়া জবাব দিল না। চৌধুরী সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, পুরনো কথা মনে রেখে লাভ নাই। আমার কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি হয়েছে। সবারই হয়। ভুলের সংশোধন করার চেষ্টা করছি।

দবির মিয়া অস্পষ্ট স্বরে কী বলল, ঠিক বোঝা গেল না। চৌধুরী সাহেব বললেন, বহু ঝামেলা করতে হয়েছে, বুঝলে দবির। তিন বার মরতে মরতে বাঁচলাম। এক বার তো ঘরে ঢুকে কোপ দিয়েছিল। জান তো সব। জান না?

জ্বি, জানি।

টাকাপয়সা থাকলেই ঝামেলা হয়। এখন আর এই সব ভালো লাগে না।

দবির মিয়া বলল, আমি জহুরকে বলব, চৌধুরী সাহেব। আজ রাতেই বলব।

বাজারের বড় রাস্তায় উঠে আসার মুখে সাইফুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হল। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সে চৌধুরী সাহেবকে দেখে প্রায় ছুটে এল।

চৌধুরী সাব, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কী ব্যাপার?

আমার ঘরে সন্ধ্যারাতে চুরি হয়েছে।

আছে কি তোমার ঘরে, যে চুরি হবে?

আমার হারমোনিয়ামটা চুরি হয়ে গেছে চৌধুরী সাব। ডবল রিডের হারমোনিয়াম।

দবির মিয়াকে স্তম্ভিত করে সাইফুল ইসলাম হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। চৌধুরী সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, এর মধ্যে কাঁদার কী আছে? যাও, থানায় গিয়ে ডাইরি করিয়ে আসা থানায় গিয়েছিলে?

জ্বি-না। আপনার বাড়িতে বসে ছিলাম।

আমার বাড়িতে কেন? আমি কে? যাও, থানায় যাও। এক্ষুণি যাও। সন্ধ্যারাতে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, এটা ভালো কথা না।

টুনী এবং অঞ্জু দুজনে এক খাটে শোয়। খাটটি প্রস্থে ছোট, দু জনের চাপাচাপি। হয়। এদের ঘরে কোনো ফ্যান নেই। বড় কষ্ট হয় গরমের সময়। সন্ধ্যার আগে। আগে বৃষ্টি হওয়ায় আজ অবশ্যি তেমন গরম লাগছে না। তবু টুনী বলল, গরম পড়েছে খুব। অঞ্জু কিছু বলল না। টুনী বলল, বাবা খাটটা একটু বড় করে বানালে পারতেন। তার সব কিছুতেই পয়সা বাঁচানর চেষ্টা।

অঞ্জু বলল, আমার একার জন্য খাটটা ঠিক আছে। আষাঢ় মাস পর্যন্ত কষ্ট করতে হবে।

টুনী কিছু বলল না। অঞ্জু বলল, ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে তো আপা?

মন্দ কী?

আমার কাছে ভালোই লাগল। ব্যবসা করে মনেই হয় না।

কেন, ব্যবসা করলেই মানুষ খারাপ হয় নাকি? সবাই তো আর বাবার মতো না।

কথার কথা বললাম, রাগছ কেন?

রাগছি না।

তোমার গানও থাকল।

ঐ সব থাকবে-টাকবে না। বলতে হয় তাই বলেছে। টুনী শুয়ে পড়ল। শোবার আগে জানালা বন্ধ করার নিয়ম। আজ আর কেউ জানালা বন্ধ করল না। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, বেশ লাগছে। অঞ্জু এক বার বলল, জানালা খোলা থাকলে বাবা রেগে যাবে।

যাক রেগে।

অঞ্জু মৃদু স্বরে বলল, বিয়েটা তোমার ভালোই হবে আপা।

ভালো হলেই ভালো।

চৌধুরী সাহেব সম্পর্কটা ভালো এনেছেন, তাই না আপা?

কি জানি।

মানুষ তো আর চিরকাল খারাপ থাকে না।
হুঁ।
তোমার কি মনে হয়, মামা চৌধুরী সাহেবের চাকরিটা নেবে?

আমার কিছু মনেটনে হয় না। বকবক করিস না, ঘুমা।

অঞ্জুর হঠাৎ মনে হল টুনী কাঁদছে। সে অবাক হয়ে বলল, আপা কাঁদছ না-কি?

টুনী জবাব দিল না।

২৫. খুঁটি পোঁতা হচ্ছে

নীলগঞ্জ রেলস্টেশনের উত্তরের ফাঁকা জায়গাটায় চার-পাঁচ জন লোক কী যেন করছে। খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। এক জনের হাতে কাগজ-পেন্সিল। সে গরমের মধ্যেও একটা হলদে রঙের কোট পরে আছে। চৌধুরী সাহেব রেলস্টেশন থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। হচ্ছেটা কি? কোনো সরকারী অফিস-টফিস নাকি? তাঁর তো তাহলে জানার কথা। অবশ্যি আজকাল আর আগের মত খোঁজখবর রাখতে পারেন না। কিছুদিন আগেই হঠাৎ শুনলেন নীলগঞ্জে একটা অয়েল মিল বসান হয়েছে। বিদেশী লোকজন হুট-হাট করে কাজ করে। আগেভাগে কাউকে কিছু বলে না। চৌধুরী সাহেব খবর নিয়ে জানলেন, জন খাঁ অয়েল মিল দিয়েছে। ভাটি অঞ্চলের নতুন ধনী। জলমহালে পয়সা করে এখানে পয়সার গরম দেখাতে এসেছে। চৌধুরী সাহেব এক দিন গেলেন অয়েল মিল দেখতে। মিলের কাজকর্ম এখনন শুরু হয় নি, ভিত পাকা করা হচ্ছে। জনু খাঁ খুবই খাতির করল। দাঁত বের করে বলল, গরিবের ঘরে থতির পা।

আসলাম আপনার মিল দেখতে।

দেখবার কিছু নেই জনাব। গরিবী হালতে শুরু করলাম।

গরিবী হালত বলে অবশ্যি মনে হল না। নানান কিসিমের লোকজন দেখা গেল। জনু খাঁ পানির দেশ থেকে দলবল নিয়ে এসেছে। চৌধুরী সাহেব বললেন, শুকনার দেশে বসত করবেন মনে হয়।

তা ঠিক, চৌধুরী সাব। পানির দেশে ডাকাইতের ভয়টা বেশি।

চোর-ডাকাত তো সবখানেই আছে।

শুকনা দেশের ডাকাইত আর পানির দেশের ডাকাইত–কী যে আপনি কন চৌধুরী সাব! হেঁ-হেঁ-হেঁ।

বিদেশী লোকজন ঢুকে পড়ছে নীলগঞ্জে। লক্ষণ ভালো নয়। কিছু করা দরকার। সেই বছর চৌধুরী সাহেব সরিষার ব্যবসা করবেন ঠিক করলেন। পিডিপির ইঞ্জিনীয়ারদের কি-না-কি বললেন, যার ফলে একটা ট্রান্সমিটার নষ্ট হয়ে গেল। গোটা মাসে বাতি জ্বলল মিটমিট করে। জনু খাঁ ছ মাসের মাথায় অয়েল মিল বিক্রি করে ফেলল।

চৌধুরী সাহেব স্টেশনের উত্তরের ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলেন। কড়া বোদ উঠেছে। ছাতা না আনায় তাঁর মাথা ঝাঁ-ব্য করতে লাগল। এই বছর বৃষ্টিবাদলা হচ্ছে না। খুব খারাপ লক্ষণ। চৌধুরী সাহেব গলা উচিয়ে ডাকলেন, এই যে, এই।

হলুদ কোট পরা লেকটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। গায়ে কোট থাকলেও লোকটার চেহারা চাষাড়ে। সে উদ্ধত স্বরে বলল, কী চান?

নাম কি তোমার?

উদ্ধত ধরনের লোকদের আচমকা তুমি করে বললে তাদের প্রতিরোধ ভেঙে যায় এটি একটি বহু পরীক্ষিত তথ্য। চৌধুরী সাহেব আবার বললেন, নাম কি তোমার?

নাম দিয়ে কী করবেন?

এইখানে হচ্ছেটা কি?

সিনেমা হল হবে। বিউটি ছায়াঘর।

করছেটা কে?

নেসারউদ্দিন সাহেব।

নেসারউদ্দিন সাহেবটা কে?

ময়মনসিংহের। উনার আরো দুইটা সিনেমা হল আছে। নেত্রকোণায় একটা, ময়মনসিংহে একটা।

লোকটি চৌধুরী সাহেবের প্রশ্নে নার্ভাস বোধ করছিল। তা কাটাবার জন্যেই সে সিগারেট ধরাল।

বিদেশী লোজন আসতে শুরু করেছে। ছোট নীলগঞ্জ এখন আর ঘোট নয়। আর কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো যে-কেউ ফস করে তার সামনে সিগারেট ধরাবে। চৌধুরী সাহেব ক্লান্ত পায়ে হাটতে শুরু করলেন। রোদ বড় কড়া। এই বয়সে এত রোদে হাঁটাচলা করা মুশকিল।

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের কাছে আসতেই তার মনে হল আজ সকালে স্কুল কমিটির মিটিং ছিল, তিনি আসতে পারেন নি। এরকম ভুল তাঁর হয় না। হওয়াটা ঠিক নয়। বয়সের লক্ষণ।

চৌধুরী সাহেব নীলগঞ্জ স্কুলে ঢুকে পড়লেন। হেডমাষ্টার সাহেবের ঘরে ফ্যান আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রওনা হওয়া ভালো। মিটিংয়ে কিছু হয়েছে। নাকি তাও জানা দরকার। নীলগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার সাহেব লোকটি মহা চালবাজ এবং মহা ধূর্ত। ধূর্ত লোকজন সময়ে অত্যন্ত বিনয়ী হতে পারে। এইটি চৌধুরী সাহেবের ভালো লাগে। হেডমাষ্টার সাহেব খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, শরীরটা খারাপ নাকি চৌধুরী সাহেব?

নাহ্।

হেডমাষ্টার সাহেব স্কুলের দপ্তরীকে পাঠালেন ডাব আনতে।

চৌধুরী সাহেব বললেন, কাজে আটকা পড়েছিলাম। মিটিং হয়েছে?

জ্বিনা, আপনি ছাড়া মিটিং হবে কি? বুধবারে ডেট দিয়েছি। বুধবারে কোনো অসুবিধা নাই তো?

নাহ্।

হেডমাষ্টার সাহেব গলার স্বর দু ধাপ নিচে নামিয়ে বললেন, সোবাহান মোল্লা স্কুল ফাণ্ডে দশ হাজার টাকা দিয়েছে। নতুন পয়সা হয়েছে আর কি। হা-হা-হা।

চৌধুরী সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কবে দিল?

মিটিংয়ের সময় এসে বলে গেছে।

ও।

চৌধুরী সাহেব নড়েচড়ে বসলেন; লক্ষণ মোটই ভালো নয়। এই সব নতুন পয়সাওয়ালা লোকজন ভেসে উঠতে চেষ্টা করছে। চৌধুরী সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, নীলগঞ্জে সিনেমা হল হচ্ছে।

আর বলেন কেন, দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।

চৌধুরী সাহেব উঠে পড়লেন।

ডাব আনতে গেছে, একটু বসেন চৌধুরী সাহেব।

নাহ।

একটু বসেন। এসে পড়বে।

চৌধুরী সাহেব বসলেন না।

একটা রিকশা ডেকে দিই চৌধুরী সাহেব?

রিকশা লাগবে না।

নীলগঞ্জ বদলে যাচ্ছে। রিকশা পাওয়া যায় এখন। রাস্তাঘাটে অচেনা লোকজন দেখা যায়। বড়ো বড়ো অফিসাররা এখন আর চৌধুরী সাহেবের বাড়ি এসে ওঠেন না। তাদের জন্যে সরকারী ডাকবাংলা হয়েছে।

প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে চৌধুরী সাহেব হাঁটতে লাগলেন। তৃষ্ণা পেয়েছে। ডাবটা খেয়ে এলে হত। পাশ ঘেঁষে খালি রিকশা যাচ্ছে একটা চৌধুরী সাহেব ভারি গলায় বললেন, এই থাম।

রিকশা থামল না। রিকশাওয়ালা সরু গলায় বলল, ভাড়া যাইতাম না।

নীলগঞ্জে এখন অনেকেই তাঁকে চেনে না। তিনি প্রচণ্ড একটা ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না।

মসজিদের কাছাকাছি এসে শুনলেন ওয়াজ হচ্ছে। মসজিদের ইমাম সাহেব নতুন এসেছেন। আগের ইমাম সাহেবের ঘর-সংসার ছিল। ইনি এখনো বিয়েটিয়ে করেন নি। হাতে সম্ভবত কাজকর্ম কিছু নেই। সময়ে-অসময়ে মাইক ভাড়া করে নিয়ে আসেন। চৌধুরী সাহেব শুনলেন, ভাইসব, হাদিস-কোরানের কথা আজকাল কেউ শুনে না। মেয়েরা পর্দাপুশিদা করেন। হাটে-ঘাটে গজে-গ্রামে যুবতী মেয়েরা নাভির নিচে কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়–

ইমাম সাহেব অল্পবয়স্ক বলেই যুবতী মেয়েদের কথা তার ওয়াজে বারবার আসে। ওয়াজের ফাঁকে-ফাঁকে কোরান শরীফের আয়াত পড়া হয়। তাঁর কণ্ঠ অসম্ভব মধুর বলেই শুনতে

বড়ো ভালো লাগে। কিন্তু আজ লাগছে না। চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছা হল ইমাম সাহেবকে ডেকে একটা ধমক দেন। কিন্তু তা দেওয়া সম্ভব নয়। লোকটি আল্লাহ-খোদার নাম নিচ্ছে।

২৬. কাঁঠাল গাছের নিচে

জহুর কাঁঠাল গাছের নিচে মোড়া পেতে বসে ছিল। বাড়ির অন্য কেউ এখনন ঘুম থেকে ওঠে নি। জেলখানার অভ্যেস জহুরের এখনন আছে, সূর্য ওঠার আগে ঘুম। ভাঙে। জহুর দেখল এই সাতসকালে সাইফুল ইসলাম হনহন করে আসছে। এই নিয়ে পরপর তিন দিন এল।

স্লামালিকুম জহুর ভাই।

ওয়ালাইকুম সালাম। কি ব্যাপার?

জহুর ভাই, আজকে ঠিক করেছি থানায় গিয়ে একটা ডাইরি করাব।

বেশ তো, করান।

আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্যে আসলাম।

এর মধ্যে আবার পরামর্শ কি?

না, এই বিষয়ে না। অন্য বিষয়ে।

জহুর লক্ষ করল সাইফুল ইসলাম আজ আবার একটু বিশেষ সাজগোজ করে এসেছে। ঘাড়ের কাছে পাউডারের সূক্ষ্ম প্রলেপ। মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধও আসছে গা থেকে।

সাইফুল ইসলাম কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, ভাবছি পত্রিকার অফিসে একটা চিঠি লিখব।

হারমোনিয়াম চুরির খবর পত্রিকা ছাপবে না।

জ্বি-না, সেইটা না। থানাতে এত বড়ো একটা খুন হয়ে গেল, সেই বিষয়ে।

ও।

বেনামে একটা চিঠি দিয়ে দেই, কি বলেন জহুর ভাই?

বেনামী চিঠি ওরা ছাপবে না।

সেই জন্যেই একটা পরামর্শ করতে আসলাম। ইয়ে, অন্য কারোর নাম দিয়ে দিলে কেমন হয়?

কার নাম দেবেন?

তাও তো কথা। ইয়ে, আপনার দুলাভাই শুনম চন্দ্রপুর গেছেন?

হুঁ।

ফিরবেন কবে?

কাল-পরশু ফিরবেন।

সাইফুল ইসলাম একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দুলাভাইকে কিছু বলতে চান?

জ্বি-না, জ্বি-না।

সাইফুল ইসলাম চুপচাপ বসে রইল। এক সময় বলল, টুনীকে বলেছিলাম সিও সাহেবের বাসায় গিয়ে গলাটা সাধতে। ইমনের সরগম দিয়ে দিয়েছিলাম, সে যায় না। আসলাম যখন, তাকে বলেই যাই, কি বলেন?

ঠিক আছে, বলে যান। চা-ও খেয়ে যান।

গানের মধ্যে সরগমটাই আসল। গলা যত ভালোই হোক, সাধনা না থাকলে সব শেষ।

জহুর জবাব দিল না। সাইফুল ইসলাম রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে বলল, এই যে কয়েক দিন কিছু করি নাই–এতেই আমার গলা টাইট হয়ে গেছে। সঙ্গীতের মতো কঠিন কিছু নাই।

২৭. নাশতা নিয়ে এল অঞ্জু

নাশতা নিয়ে এল অঞ্জু। বাইরের লোক আছে বলেই কিনা কে জানে, আজ একটু বিশেষ ব্যবস্থা দেখা গেল। রুটির বদলে পরোটা তৈরী হয়েছে। ডিম ভাজার সঙ্গে সেমাই দেওয়া হয়েছে। একটি পিরিচে আবার পাকা পেপে টুকরো করে কাটা। সাইফুল ইসলাম বলল, ইয়ে, টুনীর সঙ্গে একটা কথা বলার ছিল। ও আর গান শিখতে যায় না।

অঞ্জু হাসিমুখে বলল, আপার বিয়ে ঠিক হয়েছে তো, সে এখন কোথায়ও যায় না।

বিয়ে ঠিক হয়েছে, কবে?

এই তো, কয়েক দিন।

ও।

ছেলে খুব ভালো। খুব সুন্দর চেহারা।

সাইফুল ইসলাম অবাক হয়ে অঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রইল। আমাকে কেউ কিছু বলে নাই। ইয়ে, তাকে বল একটু আসতে।

টুনী ঘরের ভিতর ঢুকল না। দরজার পাশে দাঁড়াল। অঞ্জুর কাছে মনে হল টুনীর চোখ দুটি অস্বাভাবিক ফোলা-ফোলা। যেন প্রচুর কান্নাকাটি করে এসেছে।

টুনী স্বরে বলল, স্যার ডেকেছিলেন?

হুঁ।

কিছু বলবেন?

না, বলব আর কি? সিও সাহেবের বাসায় যাও না। ভাবলাম...

টুনী তাকিয়ে রইল। সাইফুল ইসলাম কথার মাঝখানে থেমে গেল। যেন আর তার কিছু বলার নেই। টুনী বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে করে রান্নাঘরে চলে গেল।

অঞ্জু চায়ের চিনি আনতে গিয়ে দেখে টুনী রুটি বেলছে। তার চোখে সূক্ষ্ম জলের রেখা। অজু কিছু বলল না। তার নিজেরও কান্না আসতে লাগল।

চুরি তো তিন-চার দিন আগে হয়েছে, এত দিন পর আসলেন যে?

সাইফুল ইসলাম ঢোক গিলল। ওসি সাহেব বললেন, হারমোনিয়াম ছাড়া আর কী গেছে?

আর কিছু না।

চুরি-টুরি হলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট হলে আমরা খোঁজখবর করতে পারি। দাগী চোরদের ডেকে ধমকামকি দিলে বের হয়ে পড়ে। বুঝলেন?

জি স্যার।

আরে, চুরি তো ছোট জিনিস, খুনের খবর দিতেই লোক তিন-চার দিন দেরি করে।

সাইফুল ইসলাম কথা বলল না। ওসি সাহেব বললেন, কেন দেরি করে জানেন?

জ্বি-না।

কাকে কাকে আসামী দেবে, সেই শলাপরামর্শ করতে গিয়ে দেরি হয়। যত পুরনো শত্র আছে, সব আসামী দিয়ে দেয়। বুঝলেন?

জি স্যার।

তার ফলে আসল যে কালটি, তার কিছু হয় না। আরে ভাই, পুলিশ যে খারাপ তা তো সবাই জানে, আপনারাও যে খারাপ–এইটা সবাই জানে না।

ওসি সাহেব চুরির এফআইআর করলেন। হারমোনিয়াম কোন দোকানের, কবে কেনা, সব লেখা হলে বললেন, এর নিচে নাম সই করেন। ঠিকানা লেখেন। দেখব, কিছু হয় কিনা।

সাইফুল ইসলাম নাম সই করল। সেই নামের দিকে ওসি সাহেব দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

জি স্যার, করেন।

মনসুরের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছেন, এর কারণ বলেন তো?

সাইফুল ইসলাম ঢোক গিলল।

ওর বাবাকে কয়েক দিন রেখেছেনও আপনার এখানে। ঠিক না?

জ্বি স্যার।

ঐ টাউটটা এখন কোথায়?

বাড়িতে চলে গেছে।

আপনি তো বেনামী চিঠিপত্র ছাড়ছেন চারিদিকে। ঠিক না?

সাইফুল ইসলাম কপালের ঘাম মুছল। তারপর শুকনো গলায় বলল, স্যার, এক গ্রাস পানি খাব।

এই, এঁকে পানি দাও তো এক গ্লাস। পানি খেয়ে ঠাণ্ডা হন। ঠাণ্ডা হয়ে জবাব দেন।

সাইফুল ইসলাম কলকল করে ঘামতে লাগল।

হুঁ, এখন বলেন তো মতলবটা কী? শোনেন, দশ বছর ধরে পুলিশে আছি। আমাদের কারবারই খারাপ লোকদের সাথে। আপনার মতো লোক বহুত দেখেছি। মিচা শয়তান। আড়ালে কলকাঠি নাড়াবার আসল শয়তান।

আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় কমিয়ে দিলেন ওসি সাহেব। সাইফুল ইসলাম স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মনে হল পায়জামাটা ভিজে গেছে। প্রস্রাব হয়ে গেছে। সম্ভবত।

চলেন আমার সাথে। আপনার ঘর সার্চ করব।

জ্বি, কী বললেন স্যার?

আপনার ঘর সার্চ হবে।

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

মিচা শয়তান, ছিঁচকা শয়তান, সব শয়তান টাইট দেওয়ার ওষুধ আমাদের আছে। ওঠেন তো দেখি এখন।

২৮. ট্রেন থেকে নেমে

ট্রেন থেকে নেমেই দবির মিয়া খবরটা শুনল–সাইফুল ইসলামকে বিশ বার কানে ধরে ওঠ-বস করা হয়েছে।

সে একটা কাণ্ড দবির ভাই, বাজারের সব লোক আসছিল মজা দেখতে। সাইফুল ইসলামের কান্দন যদি দেখতেন। হা-হা-হা-।

বিষয় কি?

আর বলেন কেন, মেয়েছেলেদের কাছে লেখা খারাপ খারাপ চিঠি পাওয়া গেছে। চৌধুরী সাহেবের কাছে সব আছে।

কানে ধরে উঠ-বস করিয়েছে কে?

সালিসি হয়েছে। চৌধুরী সাহেব ছিলেন। থানাওয়ালারা ছিল। মোক্তার সাব ছিল। সরদার বাড়ির লোকও ছিল। ধুন্ধুমার কাণ্ড।

দবির মিয়া নিজের দোকানে এসে পৌছাবার আগে আরো তিন বার সমস্ত ব্যাপারটা শুনল। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলেই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করছে, ব্যাপার শুনছেন নাকি?

হুঁ, শুনেছি।

কানে ধরে উঠ-বস করয়েছে। হা-হা-হা।

শুনেছি।

আর কান্দা যদি দেখতেন। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যান। চিঠি সব। আছে তাঁর কাছে।

চিঠি দিয়ে আমি করব কি?

আপনার মেয়ের কাছে লেখা চিঠিও তো থাকতে পারে। সেও তো গান শিখেছে।

দবির মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলে কি।

কোনো ভদ্রলোকের ছেলে এমন চিঠি লেখতে পারে। চিঠিতে হাত দিলে হাত দেওয়া লাগে সাবান দিয়ে, বুঝলেন। হা-হা-হা।

সন্ধ্যার পর দবির মিয়া চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। চৌধুরী সাহেব বললেন, ঘটনা শুনেছ?

জ্বি, শুনলাম।

অনেকে বলছিল মাথা কামিয়ে দিতে। সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

যেটা করেছেন, সেটাই বিরাট বাড়াবাড়ি হয়েছে চৌধুরী সাব।

বল কি তুমি দবির।

নিজের ঘরে বসে চিঠি লিখেছে, তাতে কী যায় আসে?

পড়ে দেখ তুমি। তোমার মেয়ের কাছে লেখা চিঠিও আছে।

থাকুক। চিঠি তো সে পাঠায় নাই।

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, সব চিঠি যে পাঠায় না, তা-ও ঠিক না। থানাওয়ালাদের কাছে দুইটা চিঠি লিখেছে। পত্রিকা অফিসে লিখেছে। আমার কাছে লিখেছে।

আপনার কাছে কী লিখেছে?

আমি নাকি খুনখারাবি করি। আমি নাকি বুড়া শয়তান। ছোটলোকের আস্পর্ধা দেখ!

চৌধুরী সাহেব একদলা থুথু ফেললেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হল পুরনো শক্তিসামর্থ্য ফিরে পাচ্ছেন। তিনি শক্ত সুরে বললেন, একে আমি নীলগঞ্জ ছাড়া করব। আমার সাথে ফাইজামি।

দবির মিয়া বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে। ঘর অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি নেই। রান্নাঘরে শুধু হারিকেন জ্বলছে। জহুর বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল। দুলাভাইকে দেখে ফেলে দিল। দবির মিয়া শান্ত সুরে বলল, বাজারের ঘটনা শুনেছ?

জি, শুনেছি।

বাজারে গিয়েছিলে?

জ্বি-না।

দবির মিয়া বেঞ্চির উপর বসল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, এত বড়ো একটা অন্যায় হয়েছে, আর তুমি কিছুই করলা না?

জহুর চুপ করে রইল।

তুমি মাছের মতো হয়ে গেছ জহুর।

জহুর জবাব দিল না। দবির মিয়া দীর্ঘ সময় অন্ধকারে বসে রইল। একটি সিগারেট ধরিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, সব মানুষ মাছের মত হলে বাঁচা যায় না। দুএক জন অন্যরকম মানুষ লাগে। জহুর অস্পষ্টভাবে কী বলল, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

টুনী এসে বলল, ভাত দেওয়া হয়েছে বাবা।

দবির মিয়া নড়ল না, বসেই রইল।

২৯. রাজকন্যার মতো দেখাচ্ছে

সাইফুল ইসলাম মজা খালের পাশে উবু হয়ে বসে ছিল। তার পেছনে দুটি প্রকাণ্ড গাবগাছ। জায়গাটা ঝোপেঝাড়ে ভর্তি। সাপের আড়া নিশ্চয়ই, কিন্তু সাইফুল ইসলামের কেন জানি ভয় করছিল না। দুপুরের দিকে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা হয়েছিল, এখন সেটাও নেই। থানার ঘড়িতে রাত নটা বাজার পর একটি শেয়াল তাকে বারবার উঁকি দিয়ে দেখে যেতে লাগল। মরা মানুষ ভেবেছে বোধ হয়। সাইফুল ইসলাম বলল, যা, যা।

শেয়ালটা নড়ল না।

সাইফুল ইসলামের হঠাৎ করে জহুর ভাইয়ের কথা মনে পড়ল। জহুর ভাই নাকি এক বার চৌধুরী সাহেবের পাঞ্জাবির কলার চেপে ধরে বলেছিল, হাতজোড় করে মাফ চাও, না হলে এইখানেই খুন করে ফেলব।

চৌধুরী সাহেব হাতজোড় করে মাফ চেয়েছিলেন। কত দিনের কথা, এখন লোকে সেই ঘটনাটা মনে রেখেছে। তার নিজের কেন এ রকম সাহস নেই?

শেয়ালটা আরেকটু এগিয়ে এল। সাইফুল ইসলাম মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মারল। শেয়ালটা খানিকটা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তাকিয়ে রইল।

কটা বাজে? থানার ঘড়িতে নটার ঘন্টা মনে হয় এক যুগ আগে বেজেছে। সময় আর যাচ্ছে না। রাত এগারটায় একটা ট্রেন আছে। সে কি পালিয়ে যাবে রাত এগারটায়? কিন্তু পালিয়ে যাবেটা কোথায়? শেয়ালটা এগিয়ে আসছে আবার। সে আবার একটা ঢিল ছুঁড়ল।

টিলের শব্দে সড়াৎ করে কী-একটা যেন নামল পানিতে। সাপ নাকি? সাইফুল ইসলাম হঠাৎ লক্ষ করল সাপের অয়টা তার কেটে গেছে। অবশ্যি মনসুরের বাবা বরকত আলি তার জন্যে একটা শিকড় আনবেন বলে গেছেন। সেটি সঙ্গে থাকলে সাপ দশ হাত দূরে থাকবে। সত্যি সত্যি এমন কিছু কি আছে?

মসজিদ থেকে মিষ্টি সুরে ওয়াজ হচ্ছে। কথাগুলি বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় পর্দা-পুশিদার উপর বলা হচ্ছে। হায়াহীন মেয়েদের কথা, যারা নাভির নিচে শাড়ি পরে, বেগানা পুরুষের দিকে ড্যাবডাব করে তাকায়। যাদের পাতলা রাউজের ভেতর দিয়ে সবকিছুই দেখা যায়– ওয়স্তাগফেরুল্লাহ! এই রমণীদের জন্যে হাবিয়া দোযখ।

সাইফুল ইসলাম উঠে দাঁড়াল। বরকত আলি সাহেবকে সে শনিবারে আসতে বলেছে। কিছুই হয়ত করা যাবে না। এক বার শেষ চেষ্টা করলে কেমন হয়? আর কেউ না থোক, জহুর ভাই তো নিশ্চয়ই তার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

রান্নাঘরে নতুন করে চারটি চাল ফোটাচ্ছে টুনী। সে দেখে এসেছে মামা বারান্দায় নেই। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, মামা গিয়েছে সাইফুল ইসলামকে আনতে। নিয়ে এলে সে নিশ্চয়ই চারটি ভাত খাবে এখানে। টুনী বসে আছে উনুনের পাশে। তার চেহারা তেমন ভাল নয়। কিন্তু আগুনের লালচে আচে তাকে রাজকন্যার মতো দেখাচ্ছে। আগুনের পাশে মানুষকে সব সময়ই সুন্দর দেখায়।